ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ৪র্থ পত্র: উসূলুল ইফতা ওয়াল ফিকহুল মুকারান

ক বিভাগ : উসূলুল ইফতা – (সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন)

ফতোয়ার সংজ্ঞা ও ফতোয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি

প্রশ্ন-০১: ফতোয়ার শাব্দিক সংজ্ঞা কী? [ما هو التعريف اللغوي للفتوى؟]
প্রশ্ন-০২: ফকীহদের নিকট ফতোয়ার পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। [عرف الفتوى اصطلاحا عند الفقهاء.]
প্রশ্ন-০৩: ইসলামে ফতোয়া প্রবর্তনের হিকমত কী? [ما هي الحكمة من تشريع الفتوى في الإسلام؟]
প্রশ্ন-০৪: ফতোয়া ও বিচার (ক্বাযা)-এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য উল্লেখ কর। [اذكر أهم فرق واحد بين الفتوى والقضاء (الحكم).]
প্রশ্ন-০৫: 'ইলমুল ফতোয়া' কী? [ما هو "علم الفتوى"؟]
প্রশ্ন-০৬: 'রসমুল মুফতী' লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন কখন দেখা দেয়? [متى نشأت الحاجة إلى تدوين "رسم المفتي"؟]
প্রশ্ন-০৭: 'উকূদ রসমিল মুফতী' নামক মনজুমাহ-এর লেখক কে? [من هو مؤلف منظومة "عقود رسم المفتي"؟]
প্রশ্ন-০৮: ইলমের দিকে থেকে অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ফতোয়া দেওয়ার বিধান কী? [ما حكم الإفتاء لغير المؤهل علميا؟]
প্রশ্ন-০৯: প্রশ্ন (ইস্তিফতা) ছাড়া ফতোয়া দেওয়া কি সঠিক? [هل تصح الفتوي بغير سؤال (استفتاء)؟]
প্রশ্ন-১০: ফতোয়া ও ইজতিহাদের মধ্যে সম্পর্ক কী? [ما هي العلاقة بين الفتوى والاجتهاد؟]

ফতোয়ার আদব ও শর্তাবলি

প্রশ্ন-১১: ফতোয়ার যোগ্যতা কী? [ما هي "أهلية الفتوى"؟]
প্রশ্ন-১২: মুফতীর দুটি মৌলিক ইলমি গুণ উল্লেখ কর। [اذكر صفتين علميتين أساسيتين للمفتي.]

প্রশ্ন-১৩: মুফতীর কাজে সৎ নিয়তের গুরুত্ব কী? [ما هي أهمية النية الصالحة في عمل المفتي؟]
প্রশ্ন-১৪: মুফতীর ব্যক্তিগত দুটি আদব উল্লেখ কর। [اذكر اثنين من "آداب المفتي" المتعلقة بشخصه.]
প্রশ্ন-১৫: ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবকাশ অন্বেষণ করা (তাতাব্বু রুখাস)-এর বিধান কী? [ما حكم تتبع الرخص (التسهيلات) في الفتوى؟]
প্রশ্ন-১৬: মুফতী ফতোয়াপ্রার্থীর সাথে কেমন আচরণ করবেন? [كيف يتعامل المفتي مع المستفتي (السائل)؟]
প্রশ্ন-১৭: প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত 'শারায়িতুল ফতোয়া' (ফতোয়ার শর্তাবলি)-এর একটি কী? [ما هي إحدى "شرائط الفتوى" المتعلقة بالسؤال؟]
প্রশ্ন-১৮: মুফতীর জন্য হানাফী মাযহাবের হাফেয তথা ব্যাপক জ্ঞান রাখা কি শর্ত? [هل يشترط في المفتي أن يكون حافظا للمذهب الحنفي؟]
প্রশ্ন-১৯: মসজিদে ফতোয়া দেওয়ার সময় যে শিষ্টাচারগুলো মেনে চলতে হয় তা কী কী? [ما هي الآداب التي يجب الالتزام بها عند الإفتاء في المسجد؟]
প্রশ্ন-২০: "আদাবুল ফতোয়া"-এর অর্থ কী? [ما معنى "آداب الفتوى"؟]

মুজতাহিদদের স্তর ও হানাফী ফকীহগণ

প্রশ্ন-২১: হানাফীদের নিকট 'মুজতাহিদুল মাযহাব'-এর সংজ্ঞা দাও। [عرف "مجتهد المذهب" عند الحنفية.]
প্রশ্ন-২২: 'মুজতাহিদে মুতলাক্ব মুনতাসিব'-এর প্রধান উদাহরণ কে? [من هو أبرز مثال لـ"مجتهد مطلق منتسب"؟]
প্রশ্ন-২৩: 'মুজতাহিদুল মাসায়েল' ও 'মুজতাহিদুল মাযহাব'-এর মধ্যে পার্থক্য কী? [ما الفرق بين "مجتهد المسائل" و"مجتهد المذهب"؟]
প্রশ্ন-২৪: 'মুজতাহিদে তারজীহ' স্তরের দুজন ইমামের নাম উল্লেখ কর। [اذكر اثنين من الأئمة في طبقة "مجتهدي التخريج".]
প্রশ্ন-২৫: হানাফী মাযহাবে 'মুজতাহিদুল ফতোয়া'-এর ভূমিকা কী? [ما هو دور "مجتهد الفتوى" في المذهب الحنفي؟]
প্রশ্ন-২৬: হানাফী মাসয়ালাসমূহের মৌলিক স্তরগুলো কী কী? [ما هي "طبقات مسائل الأحناف" الأساسية؟]

প্রশ্ন-২৭: ‘যাহিরুর রিওয়ায়া’-এর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দাও। [عرف "ظاهر الرواية" بإيجاز.]
প্রশ্ন-২৮: ‘মাসায়িলুন নাওযাদের’ কী? [ما هي "مسائل النوادر"؟]
প্রশ্ন-২৯: ‘মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত’ কী? [ما هي "مسائل الواقعات"؟]
প্রশ্ন-৩০: যে মাসায়েল যাহিরুর রিওয়ায়া-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা দিয়ে ফতোয়া দেওয়ার বিধান কী? [ما حكم الإفتاء بالمسائل التي ليست من ظاهر الرواية؟]

নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ

প্রশ্ন-৩১: হানাফীদের নিকট ‘নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ’-এর দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [اذكر اثنين من خصائص "الكتب المعتمدة" عند الحنفية.]
প্রশ্ন-৩২: ‘যাহিরুর রিওয়ায়া’-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব কোনটি? [ما هو أهم كتاب في "ظاهر الرواية"؟]
প্রশ্ন-৩৩: হানাফীদের নিকট ফতোয়ার জন্য একটি অ-নির্ভরযোগ্য কিতাবের নাম উল্লেখ কর। [اذكر اسم كتاب واحد غير معتمد عند الحنفية في الإفتاء.]
প্রশ্ন-৩৪: হানাফী পরিভাষা ‘আল-আসাহ’-এর অর্থ কী? [ما معنى المصطلح "الأصح" الحنفي؟]
প্রশ্ন-৩৫: হানাফী ফিকহের কিতাবসমূহে ‘আল-মুতামাদ’ (নির্ভরযোগ্য)-এর তাৎপর্য কী? [ما دلالة المصطلح "المعتمد" في كتب الفقه الحنفي؟]
প্রশ্ন-৩৬: হানাফী ফকীহগণের পরিভাষায় ‘আশ-শাইখান’ (দুই শায়খ) কারা? [من هم "الشيخان" في اصطلاح فقهاء الأحناف؟]
প্রশ্ন-৩৭: মাযহাবের মধ্যে তাদের উক্তি: ‘দাইফুন কওলুন’ (দুর্বল উক্তি)-এর অর্থ কী? [ما معنى قولهم: "قول ضعيف" في المذهب؟]
প্রশ্ন-৩৮: ‘আল-মুখতার লিল-ইফতা’ (ফতোয়ার জন্য মনোনীত)-এর তাৎপর্য কী? [ما هي دلالة مصطلح "المختار للإفتاء"؟]
প্রশ্ন-৩৯: ফিকহী সংকলনে ‘মতন’ (মূলপাঠ) ও ‘শরাহ’ (ব্যাখ্যা)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? [ما الفرق بين "المتن" و"الشرح" في التصنيف الفقهي؟]
প্রশ্ন-৪০: মাযহাবের নির্ভরযোগ্য উক্তির বিপরীত ফতোয়া দেওয়ার বিধান কী? [ما حكم الإفتاء بما يخالف القول المعتمد في المذهب؟]

তারজীহের মূলনীতি

প্রশ্ন-৪১: ‘ক্বাওয়ায়েদু আত-তারজীহ’ (অগ্রাধিকারের মূলনীতিসমূহ) কী? [ما هي "قواعد الترجيح"؟]

প্রশ্ন-৪২: বিভিন্ন উক্তিগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের একটি মূলনীতি উল্লেখ কর। [اذكر قاعدة واحدة للترجيح بين الأقوال المختلفة.]

প্রশ্ন-৪৩: ‘আলাইহিল ফতোয়া’ (এ মতের উপর ফতোয়া)-এর তাৎপর্য কী? [ما هي دلالة مصطلح "عليه الفتوى"؟]

প্রশ্ন-৪৪: ফিকহী মাসায়েলের প্রেক্ষাপটে ‘আত-তাসহীহ’ (শুদ্ধ প্রমাণ)-এর অর্থ কী? [ما هو "التصحيح" في سياق المسائل الفقهية؟]

প্রশ্ন-৪৫: ‘মফহুমুল মুখালাফ’ (বিপরীত ধারণা) কী? [ما هو "مفهوم المخالف"؟]

প্রশ্ন-৪৬: হানাফীগণ কেন শরীয়তের বক্তব্যসমূহে ‘মফহুমুল মুখালাফা’-কে দলীল হিসেবে গণ্য করেন না? [لماذا لا يعتبر الحنفية "مفهوم المخالف" حجة في خطابات الشارع؟]

প্রশ্ন-৪৭: ‘ইতিবারুল উরূফ ওয়াল আদা’ (প্রথা ও রীতির স্বীকৃতি)-এর মূলনীতিটি কী? [ما هي "قاعدة اعتبار العرف والعادة"؟]

প্রশ্ন-৪৮: ফতোয়ার ক্ষেত্রে উরূফ অনুযায়ী আমল করার একটি শর্ত উল্লেখ কর। [اذكر شرطا واحدا للعمل بالعرف في الفتوى.]

প্রশ্ন-৪৯: যে প্রথার ভিত্তিতে বিধান দেওয়া হয়েছিল, যদি তা পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে ফতোয়ার বিধান কী হবে? [ما حكم الفتوى إذا تغير العرف الذي بني عليه الحكم؟]

প্রশ্ন-৫০: তাদের উক্তি: “যুগের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তনকে অস্বীকার করা যায় না”-এর অর্থ কী? [ما معنى قولهم: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة"؟]

মুফতীর আদবসমূহ

প্রশ্ন-৫১: ‘আদাবু কিতাবাতিল ফতোয়া’ (ফতোয়া লেখার শিষ্টাচার) কী? [ما هو "آداب كتابة الفتوى"؟]

প্রশ্ন-৫২: ফতোয়ার বিন্যাস সাধারণ মানুষের জন্য কীভাবে উপযুক্ত হবে? [كيف تكون صياغة الفتوى مناسبة لعامة الناس؟]
প্রশ্ন-৫৩: অর্থ ক্ষুণ্ন না করে ফতোয়া সংক্ষিপ্ত করার বিধান কী? [ما حكم اختصار الفتوى دون إخلال بالمعنى؟]
প্রশ্ন-৫৪: ফতোয়া লেখার সময় মুফতীর জন্য বর্জনীয় একটি বিষয় উল্লেখ কর। [اذكر أمرا يجب على المفتي تجنبه عند كتابة الفتوى.]
প্রশ্ন-৫৫: ‘নাওয়াবিল’ (নতুন সৃষ্ট মাসায়েল)-এ মুফতীর ভূমিকা কী? [ما هو دور المفتي في "النوازل" (القضايا المستجدة)؟]
প্রশ্ন-৫৬: ‘জরুরত’ (অপরিহার্যতা) কীভাবে ফিকহী বিধান পরিবর্তনের উপর প্রভাব ফেলে? [كيف يؤثر "الضرورة" على تغيير الحكم الفقهي؟]
প্রশ্ন-৫৭: মাসায়েলে অগ্রাধিকারের (তারজীহ)-এ ‘আল-ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ’ (ফিকহী মূলনীতিসমূহ)-এর গুরুত্ব কী? [ما هي أهمية "القواعد الفقهية" في ترجيح المسائل؟]
প্রশ্ন-৫৮: যে ফতোয়ার ফলে অকল্যাণ (মাফসা দা) দেখা দেয়, তার বিধান কী? [ما حكم الفتوى المترتب عليها مفسدة؟]
প্রশ্ন-৫৯: মুফতী কীভাবে ‘সহজতা’ (তাইসীর) এবং ‘শরয়ী মূলনীতি মেনে চলা’ (আল-ইলতিযাম বিন নাস)-এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবেন? [كيف يوازن المفتي بين "التيسير" و"الالتزام بالنص"؟]
প্রশ্ন-৬০: মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান-এর ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ (ফিকহী মূলনীতিসমূহ) বিষয়ক কিতাবের নাম কী? [ما هو اسم كتاب المفتي السيد محمد عميم الإحسان في القواعد الفقهية؟]

ফতোয়ার সংজ্ঞা ও ফতোয়া সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি

প্রশ্ন-০১: ফতোয়ার শাব্দিক সংজ্ঞা কী?
(ما هو التعريف اللغوي للفتوى؟)

উত্তর: আরবি 'ফতোয়া' (الفتوى) শব্দটি মূলত 'ফাতওয়া' (الفتوة) ধাতু থেকে নির্গত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বেশ কয়েকটি অর্থ রয়েছে, যা ফিকহী ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১. আভিধানিক অর্থ:

- **যৌবন ও শক্তি:** 'ফাতওয়া' মানে হলো যৌবন বা যুবক। যুবকের মধ্যে যেমন শক্তি ও সজীবতা থাকে, তেমনি ফতোয়ার মাধ্যমে একটি সমস্যার শক্তিশালী ও সজীব সমাধান পাওয়া যায়।
- **স্পষ্ট করা:** কোনো জটিল বিষয়কে স্পষ্ট করে দেওয়া। আল্লামা ইবনে মনযুর (রহ.) বলেন:

الْفُتْيَا وَالْفَتْوَى: الْجَوَابُ عَمَّا يُشْكِلُ مِنَ الْأَحْكَامِ(অর্থ: ফুতয়া বা ফতোয়া হলো- বিধি-বিধানের অস্পষ্ট বিষয়গুলোর জবাব দেওয়া।)

- **নতুন কিছু প্রকাশ করা:** আরবরা বলে, 'আফতাশ শাজারু' (أفتى الشجر) অর্থাৎ গাছটি নতুন পাতা ছেড়েছে। ফতোয়ার মাধ্যমেও নতুন সমস্যার নতুন সমাধান বের হয়ে আসে।

২. কুরআনিক ব্যবহার: পবিত্র কুরআনেও শব্দটি 'জানানো' বা 'ব্যাখ্যা করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ(অর্থ: তারা আপনার কাছে ফতোয়া (সমাধান) জানতে চায়, বলুন! আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালা' সম্পর্কে ফতোয়া দিচ্ছেন। —সূরা নিসা: ১৭৬)

উপসংহার: সারকথা হলো, আভিধানিক অর্থে ফতোয়া হলো— কোনো অস্পষ্ট, জটিল বা নতুন বিষয়ের সবল ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা। শরীয়তের পরিভাষায় এটি দ্বীনী বিধান স্পষ্ট করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-০২: ফকীহদের নিকট ফতোয়ার পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। (عرف الفتوى اصطلاحا عند الفقهاء.)

উত্তর: শরীয়তের পরিভাষায় ফতোয়ার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উসূলবিদ ও ফকীহগণ বিভিন্ন ইবারত ব্যবহার করেছেন। তবে হানাফি মাযহাব ও জুমহুর ফকীহদের মতে এর সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১. পারিভাষিক সংজ্ঞা: আল্লামা ইবনে হামদান (রহ.) 'সিফাতুল ফাতওয়া' গ্রন্থে বলেন:

تَبْيِينُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَنْ دَلِيلٍ لِمَنْ سَأَلَ عَنْهُ (অর্থ: যে ব্যক্তি প্রশ্ন করেছে, তার জন্য দলিলের আলোকে শরয়ী হুকুম স্পষ্ট করে দেওয়াকে ফতোয়া বলে।)

হানাফি ফকীহগণের মতে সহজ সংজ্ঞা হলো:

هُوَ الْإِخْبَارُ عَنْ حُكْمِ اللهِ تَعَالَى فِي النَّازِلَةِ مِنْ غَيْرِ إِلْزَامٍ (অর্থ: উদ্ভূত কোনো সমস্যার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা ছাড়া আল্লাহ তাআলার হুকুম সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া বা জানিয়ে দেওয়া।)

২. সংজ্ঞার বিশ্লেষণ:

- **আল-ইখবার (সংবাদ দেওয়া):** মুফতী নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলেন না, বরং তিনি আল্লাহর বিধানের সংবাদবাহক মাত্র।
- **আন হুকমিল্লাহ (আল্লাহর বিধান):** ফতোয়া অবশ্যই শরীয়তের বিধান হতে হবে, দুনিয়াবী কোনো পরামর্শ ফতোয়া নয়।
- **মিন গায়রি ইলযাম (বাধ্যবাধকতা ছাড়া):** এটিই ফতোয়ার মূল বৈশিষ্ট্য। বিচারক (কাজি) রায় দিলে তা মানা বাদী-বিবাদীর ওপর বাধ্যতামূলক হয়, কিন্তু মুফতী কেবল বিধান জানিয়ে দেন, তিনি কাউকে তা মানতে বাধ্য করতে পারেন না। মানা না মানা প্রশ্নকারীর দ্বীনদারির ওপর নির্ভরশীল।

উপসংহার: সুতরাং, ফতোয়া হলো কোনো জিজ্ঞাসিত বিষয়ে শরীয়তের দলিলভিত্তিক সমাধান প্রদান করা, যা পালন করা প্রশ্নকারীর জন্য দ্বীনী দায়িত্ব, কিন্তু আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়।

প্রশ্ন-০৩: ইসলামে ফতোয়া প্রবর্তনের হিকমত কী?
(ما هي الحكمة من تشريع الفتوى في الإسلام؟)

উত্তর: ইসলামে ফতোয়া প্রবর্তনের পেছনে মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ হিকমত ও তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। এটি মুসলিম উম্মাহর দ্বীনী ও দুনিয়াবী শৃঙ্খলা রক্ষার অন্যতম মাধ্যম। এর প্রধান কয়েকটি হিকমত নিম্নরূপ:

১. আল্লাহর বিধান জানা ও মানা: সকল মানুষ শরীয়তের জ্ঞান রাখে না। তাই যারা জানে না, তাদের জন্য জানার ব্যবস্থা হিসেবে ফতোয়া প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(অর্থ: তোমরা যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর। —সূরা নাহল: ৪৩)

২. নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা রক্ষা: রাসূলুল্লাহ (সা.) ছিলেন ওহীর মাধ্যমে মুফতী। তাঁর ইন্তেকালের পর উম্মাহ যেন পথভ্রষ্ট না হয়, সেজন্য আলেমদের ফতোয়া প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হাদীসে এসেছে:

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ(অর্থ: আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ।) ফতোয়ার মাধ্যমে মুফতীগণ নবীদের এই মীরাস বা উত্তরধিকার রক্ষা করেন এবং মানুষকে সঠিক পথ দেখান।

৩. বিচার ও বিবাদ মীমাংসা: সমাজে মানুষের মধ্যে লেনদেন, বিবাহ, তালাক ও উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। ফতোয়ার মাধ্যমে শরীয়তের সঠিক সমাধান পেয়ে মানুষ বিবাদ থেকে মুক্ত হতে পারে এবং সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪. নতুন সমস্যার সমাধান (নাওয়াজিল): যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে নিত্যনতুন সমস্যা (যেমন- আধুনিক ব্যাংকিং, ডিজিটাল কারেন্সি) সৃষ্টি হয়। ফতোয়া ব্যবস্থা না থাকলে ইসলাম স্থবির হয়ে যেত। ফতোয়ার মাধ্যমেই ইসলামকে যুগোপযোগী ও গতিশীল রাখা সম্ভব হয়।

উপসংহার: মূলত, মুসলিম উম্মাহকে জাহালত বা অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে রক্ষা করা এবং কিয়ামত পর্যন্ত শরীয়তের ওপর অটল রাখার জন্য মহান আল্লাহ ফতোয়ার বিধান প্রবর্তন করেছেন।

প্রশ্ন-০৪: ফতোয়া ও বিচার (ক্বাযা)-এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য উল্লেখ কর।

(اذكر أهم فرق واحد بين الفتوى والقضاء (الحكم).)

উত্তর: ফতোয়া (الفتوى) এবং বিচার বা ক্বাযা (القضاء) উভয়ই শরীয়তের বিধান প্রকাশের মাধ্যম। কিন্তু এদের মধ্যে মৌলিক ও কাঠামোগত পার্থক্য রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি হলো 'বাধ্যবাধকতা' বা 'ইলযাম' (الإلزام)-এর ক্ষেত্রে।

পার্থক্য: বাধ্যবাধকতা (Binding Authority):

১. ফতোয়ার প্রকৃতি: ফতোয়া হলো সংবাদ প্রদান বা 'ইখবার' (الإخبار)। মুফতী যখন ফতোয়া দেন, তখন তিনি আল্লাহর হুকুমটি জানিয়ে দেন। কিন্তু সেই হুকুম বাস্তবায়ন করার বা জোর করে মানানোর কোনো ক্ষমতা মুফতীর হাতে থাকে না।

الْفَتْوَى إِخْبَارٌ عَنْ حُكْمِ اللهِ تَعَالَى بِلَا إِلْزَامٍ(অর্থ: ফতোয়া হলো বাধ্যবাধকতা ছাড়াই আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া।) প্রশ্নকারী ফতোয়াটি মানবে কি না, তা তার তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতির ওপর নির্ভর করে।

২. বিচারের (ক্বাযা) প্রকৃতি: বিচার বা ক্বাযা হলো আদেশ প্রদান বা 'ইনশা' (الإنشاء)। বিচারক যখন রায় দেন, তখন তা বিবাদমান পক্ষগুলোর ওপর মানা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে তা কার্যকর করা হয়।

الْقَضَاءُ هُوَ الْإِلْزَامُ بِالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ وَفَصْلُ الْخُصُومَةِ(অর্থ: ক্বাযা হলো শরয়ী হুকুম মানতে বাধ্য করা এবং বিবাদ মীমাংসা করা।)

উদাহরণ: এক ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিল কি না—এ বিষয়ে মুফতী বলবেন "তালাক হয়েছে" (যদি শর্ত পাওয়া যায়)। এটি ফতোয়া। কিন্তু স্বামী যদি অস্বীকার করে, তবে মুফতী তাকে বাড়ি থেকে বের করতে পারবেন না। কিন্তু বিষয়টি কাজির আদালতে গেলে, কাজি রায় দেবেন "তালাক কার্যকর হয়েছে" এবং রাষ্ট্রশক্তির মাধ্যমে তাদের আলাদা করে দেবেন। এটি ক্বাযা।

উপসংহার: সুতরাং, প্রধান পার্থক্য হলো— ফতোয়া কেবল পথ দেখায় (Guidance), আর ক্বাযা বা বিচার সেই পথে চলতে বাধ্য করে (Enforcement)।

প্রশ্ন-০৫: 'ইলমুল ফতোয়া' কী? (ما هو "علم الفتوى"؟)

উত্তর: 'ইলমুল ফতোয়া' (علم الفتوى) বা ফতোয়া শাস্ত্র হলো ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের একটি বিশেষ ও গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এটি কেবল মাসআলা মুখস্থ করার নাম নয়, বরং এটি একটি প্রায়োগিক বিজ্ঞান।

সংজ্ঞা: 'ইলমুল ফতোয়া' হলো এমন একটি শাস্ত্র, যার মাধ্যমে ফিকহী মাসআলাগুলোকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার পদ্ধতি, মুফতীর যোগ্যতা, ফতোয়া বের করার নিয়মাবলী এবং প্রশ্নকারীর অবস্থাভেদে বিধান পরিবর্তনের কৌশল জানা যায়।

هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ مَعَ مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ تَنْزِيلِهَا عَلَى الْوَقَائِعِ (অর্থ: বিস্তারিত দলিল থেকে অর্জিত শরয়ী আমলী বিধানাবলীর জ্ঞান এবং বাস্তব ঘটনার ওপর সেই বিধান প্রয়োগ করার পদ্ধতি জানাকে ইলমুল ফতোয়া বলে।)

বিষয়বস্তু: এই ইলমের প্রধান আলোচ্য বিষয়গুলো হলো: ১. **উসূলুল ইফতা:** ফতোয়া দেওয়ার মূলনীতি। ২. **আদাবুল মুফতি:** মুফতীর শিষ্টাচার ও দায়িত্ব। ৩. **রসমুল মুফতি:** মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফতোয়া প্রদানের রীতি। ৪. **ফিকহুল ওয়াকি:** সমসাময়িক বাস্তবতা ও পরিস্থিতির জ্ঞান।

গুরুত্ব: একজন ব্যক্তি অনেক বড় আলেম বা 'আল্লামা' হতে পারেন, কিন্তু 'ইলমুল ফতোয়া' না জানলে তিনি মুফতী হতে পারেন না। কারণ, কিতাবের মাসআলা আর বাস্তব জীবনের প্রয়োগ—এই দুইয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের নামই ইলমুল ফতোয়া। এটি জানা থাকলে সমাজে ফিতনা ও বিভ্রান্তি দূর করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন-০৬: 'রসমুল মুফতী' লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন কখন দেখা দেয়? (متى نشأت الحاجة إلى تدوين "رسم المفتي"؟)

উত্তর: 'রসমুল মুফতী' (رسم المفتي) অর্থ হলো মুফতীর ফতোয়া প্রদানের রীতি বা পদ্ধতি। হানাফি মাযহাবের ইতিহাসে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এটি আলাদা

শাস্ত্র হিসেবে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু পরবর্তী যুগে বিশেষ কিছু কারণে এটি লিপিবদ্ধ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপট ও সময়কাল: মূলত **হিজরী দশম শতাব্দীর পর থেকে**, বিশেষ করে হানাফি মাযহাবের পরবর্তী যুগের (মুতাআখখিরিন) ফকীহগণের সময়কালে 'রসমুল মুফতী' লিপিবদ্ধ করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। এর চূড়ান্ত রূপ দেন আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) (মৃত: ১২৫২ হি.)।

কারণসমূহ: ১. বর্ণনার আধিক্য (تعدد الروايات): হানাফি মাযহাবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর ছাত্রদের থেকে একই মাসআলায় একাধিক বর্ণনা (রিওয়ায়াত) পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগের মুফতীদের জন্য কোনটি শক্তিশালী আর কোনটি দুর্বল—তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। ২. **যোগ্যতার অভাব:** যুগের পরিবর্তনে মুজতাহিদ ফকীহদের সংখ্যা কমে যায় এবং মুকাল্লিদ মুফতীদের সংখ্যা বাড়ে। যারা নিজেরা ইজতেহাদ করে সঠিক মত বের করতে অক্ষম ছিলেন। ৩. **ফিতনা ও যুগের পরিবর্তন (فساد الزمان):** যুগের চাহিদার কারণে অনেক মাসআলায় পূর্ববর্তী হুকুম পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। কোন নীতিতে এই পরিবর্তন হবে, তা নির্ধারণের জন্য নিয়মনীতির প্রয়োজন ছিল।

ফলাফল: এই প্রয়োজনেই আল্লামা শামী (রহ.) 'শরহু উকুদ রসমিল মুফতী' রচনা করেন। যেখানে তিনি শেখান— কখন 'যাহিরুর রিওয়ায়া' নিতে হবে, কখন 'নাওয়াদির' গ্রহণ করা যাবে এবং কখন 'উরফ' বা প্রথার কারণে ফতোয়া বদলানো যাবে। সুতরাং, মাযহাবকে বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করতেই এটি লিপিবদ্ধ করা হয়। [১, ৩, ২১]

প্রশ্ন-০৭: 'উকূদ রসমিল মুফতী' নামক মনজুমাহ-এর লেখক কে? (من هو مؤلف منظومة "عقود رسم المفتي"؟)

উত্তর: 'উকূদ রসমিল মুফতী' (عقود رسم المفتي) হলো হানাফি ফিকহের উসূলুল ইফতা বিষয়ক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য কাব্যগ্রন্থ (মনজুমাহ)।

লেখক পরিচিতি: এই কালজয়ী গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন হানাফি মাযহাবের শেষ যুগের প্রধান স্তম্ভ, 'খাতিমাতুল মুহাক্কিকিন' (গবেষকদের সিলমোহর) খ্যাত **আল্লামা সায়্যিদ মুহাম্মদ আমিন ইবনে আবেদিন আশ-শামী (রহ.)**।

- **জন্ম:** ১১৯৮ হিজরি (দামেস্ক, সিরিয়া)।
- **মৃত্যু:** ১২৫২ হিজরি।

গ্রন্থ পরিচিতি: আল্লামা শামী (রহ.) প্রথমে 'উকূদ রসমিল মুফতী' নামে ফতোয়া প্রদানের মূলনীতিগুলো কবিতাকারে রচনা করেন। যাতে ছাত্ররা সহজে মুখস্থ করতে পারে। পরবর্তীতে তিনি নিজেই এর একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ (শরাহ) রচনা করেন, যার নাম **'শরহু উকূদি রসমিল মুফতী'**।

গুরুত্ব: বর্তমান বিশ্বে হানাফি মাযহাবের ওপর ফতোয়া দেওয়ার জন্য এই কিতাবটিই চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। এই কিতাবে তিনি মাযহাবের শক্তিশালী (রাজিহ) ও দুর্বল (মারজুহ) মত চেনার উপায় এবং ফতোয়া প্রদানের যাবতীয় নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ করেছেন। আপনার সিলেবাসের অন্যতম পাঠ্যবই এটি।

প্রশ্ন-০৮: ইলমের দিকে থেকে অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ফতোয়া দেওয়ার বিধান কী? (ما حكم الإفتاء لغير المؤهل علميا؟)

উত্তর: ইসলামে ফতোয়া প্রদান একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুদায়িত্ব। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান স্বাক্ষর করার শামিল। তাই ইলম বা জ্ঞান ছাড়া অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ফতোয়া প্রদান করা **সম্পূর্ণ হারাম এবং কবীরা গুনাহ**।

শরয়ী বিধান ও দলিল: ১. হারাম হওয়া: আল্লাহ তাআলা জ্ঞান ছাড়া কথা বলাকে শিরকের সাথে তুলনা করে হারাম ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে: > قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ ... وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ< (অর্থ: বল, আমার রব হারাম করেছেন অশ্লীলতা... এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলা যা তোমরা জানো না। —সূরা আরাফ: ৩৩)

২. **হাদীসের সতর্কবাণী:** রাসূলুল্লাহ (সা.) অযোগ্য মুফতীদের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন: > مَنْ أُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ< (অর্থ: যাকে জ্ঞান ছাড়া ফতোয়া দেওয়া হলো, তার পাপ ওই ফতোয়া দাতার

ওপর বর্তাবে।) অন্য হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের আগে মূর্খরা নেতা হবে এবং জ্ঞান ছাড়াই ফতোয়া দিয়ে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরও পথভ্রষ্ট করবে। (বুখারী)

৩. **ফকীহদের অভিমত:** আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, মূর্খ মুফতী (মুফতি মাজিন) সমাজের জন্য ক্ষতিকর। শাসকের উচিত এমন ব্যক্তিকে ফতোয়া দেওয়া থেকে নিষিদ্ধ (হাজর) করা এবং শাস্তি প্রদান করা। কারণ সে মানুষের দ্বীন ও ঈমান নষ্ট করে দেয়।

উপসংহার: সুতরাং, ফতোয়া দেওয়ার জন্য গভীর ইলম, তাকওয়া এবং ফিকহী দক্ষতা অর্জন করা ফরজ। অযোগ্য ব্যক্তির ফতোয়া দেওয়া মানে নিজেকে এবং সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া।

প্রশ্ন-০৯: প্রশ্ন (ইস্তিফতা) ছাড়া ফতোয়া দেওয়া কি সঠিক? (هل تصح الفتوي بغير سؤال (استفتاء)؟)

উত্তর: সাধারণত 'ফতোয়া' শব্দটির সাথে 'প্রশ্ন' বা 'ইস্তিফতা' (الاستفتاء) ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পারিভাষিক অর্থে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়াকেই ফতোয়া বলা হয়। তবে প্রশ্ন ছাড়াও ফতোয়া দেওয়া সঠিক কি না, এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

মূলনীতি: ১. সাধারণ নিয়ম: ফতোয়া মূলত প্রশ্নের উত্তর। তাই প্রশ্ন ছাড়া স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিধান বলাকে সাধারণত 'ফতোয়া' বলা হয় না, বরং তাকে 'ইরশাদ' (পথপ্রদর্শন), 'তালীম' (শিক্ষা) বা 'ওয়াজ' বলা হয়। > الفتوى جواب لسؤال مقدر أو محقق< (অর্থ: ফতোয়া হলো বাস্তব বা উহ্য কোনো প্রশ্নের উত্তর।)

২. **ব্যতিক্রম ও বৈধতা:** প্রশ্ন ছাড়াও ফতোয়া দেওয়া **সঠিক এবং বৈধ**, বিশেষ করে নিচের ক্ষেত্রগুলোতে:

- **জরুরত বা আবশ্যকতা:** যদি মুফতী দেখেন মানুষ কোনো হারাম কাজে লিপ্ত হচ্ছে বা ভুল করছে, কিন্তু তারা জানে না বলে প্রশ্নও করছে না। তখন মুফতীর দায়িত্ব হলো নিজে থেকেই ফতোয়া বা বিধান জানিয়ে দেওয়া। একে 'নাহি আনিল মুনকার' (অসৎ কাজে নিষেধ) বলা হয়।

- **সাধারণ সতর্কীকরণ:** সমাজে নতুন কোনো ফিতনা দেখা দিলে কেউ প্রশ্ন করার আগেই আলেমগণ সম্মিলিতভাবে যে বিবৃতি বা ফতোয়া প্রকাশ করেন, তা শরীয়তসম্মত।

হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি: হানাফি ফকীহগণের মতে, ইলম গোপন করা হারাম। তাই মানুষের প্রয়োজনে প্রশ্ন না করলেও হুকুম জানানো ওয়াজিব। তবে 'ফতোয়া' পরিভাষাটি সাধারণত প্রশ্নের উত্তরের জন্যই খাস বা নির্দিষ্ট থাকে। প্রশ্ন ছাড়া বলা কথাগুলো ফতোয়ার হুকুমে গণ্য হবে যদি তা মুফতীর পক্ষ থেকে আসে।

উপসংহার: প্রশ্ন ছাড়া বিধান বর্ণনা করা জায়েজ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিব। তবে কারিগরি অর্থে (Technically) ফতোয়া পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য প্রশ্ন থাকা উত্তম, যাতে মুফতী নির্দিষ্ট পরিস্থিতির (ওয়াকিয়া) আলোকে উত্তর দিতে পারেন।

প্রশ্ন-১০: ফতোয়া ও ইজতিহাদের মধ্যে সম্পর্ক কী? (ما هي العلاقة بين الفتوى والاجتهاد؟)

উত্তর: ফতোয়া এবং ইজতিহাদ—উভয়টিই ইসলামী আইনশাস্ত্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে, তবে উভয়টি এক নয়। এদের সম্পর্ককে 'আম-খাস' (সাধারণ-বিশেষ) বা উৎসের সাথে শাখার সম্পর্কের মতো তুলনা করা যায়।

সম্পর্কের ধরণ:

১. ইজতিহাদ (الاجتهاد): ইজতিহাদ হলো শরীয়তের মূল উৎস (কুরআন ও সুন্নাহ) থেকে গবেষণার মাধ্যমে বিধান বের করার প্রক্রিয়া। যিনি এটি করেন, তিনি হলেন 'মুজতাহিদ'।

بَذْلُ الْوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ (অর্থ: ইস্তিন্বাত বা গবেষণার মাধ্যমে শরীয়তের আমলী বিধান বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো।)

২. ফতোয়া (الفتوى): ফতোয়া হলো মানুষের জিজ্ঞাসিত সমস্যার বিধান জানিয়ে দেওয়া। এই বিধানটি মুফতী নিজে ইজতেহাদ করে বের করতে পারেন, অথবা অন্য মুজতাহিদের বের করা বিধান নকল বা বর্ণনা করতে পারেন।

৩. পারস্পরিক সম্পর্ক:

- **অতীতকালে:** ইসলামের সোনালী যুগে প্রায় সকল মুফতীই মুজতাহিদ ছিলেন। তখন ইজতেহাদ ও ফতোয়া প্রায় সমার্থক ছিল। মুফতী সরাসরি কুরআন-হাদীস গবেষণা করে ফতোয়া দিতেন।
- **বর্তমান যুগে:** বর্তমানে অধিকাংশ মুফতী হলেন 'মুকাল্লিদ' (অনুসারী)। তাঁরা নতুন করে ইজতেহাদ করেন না, বরং ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতো মুজতাহিদদের করা ইজতেহাদ বা ফিকহী কিতাব থেকে মাসআলা বের করে মানুষকে জানান।

সারসংক্ষেপ: সব মুজতাহিদই মুফতী হতে পারেন, কিন্তু সব মুফতী মুজতাহিদ নন। ইজতেহাদ হলো বিধান **তৈরি বা বের করার প্রক্রিয়া**, আর ফতোয়া হলো সেই বিধান **মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যম**। বর্তমানে ফতোয়া ইজতিহাদের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু ফতোয়া দেওয়ার জন্য নতুন ইজতিহাদ জরুরি নয়, মাযহাবের অনুসরণই যথেষ্ট।

ফতোয়ার আদব ও শর্তাবলি

প্রশ্ন-১১: ফতোয়ার যোগ্যতা কী? (ما هي "أهلية الفتوى"؟)

উত্তর: 'আহলিইয়াতুল ফতোয়া' (أهلية الفتوى) বা ফতোয়া প্রদানের যোগ্যতা হলো মুফতীর মধ্যে বিদ্যমান এমন বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা, যা তাকে শরীয়তের দলিল থেকে বিধান বের করতে বা ইমামদের ইজতেহাদ থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম করে।

সংজ্ঞা ও স্বরূপ: ফকীহদের মতে, ফতোয়ার যোগ্যতা দুই ধরনের: ১. **প্রাকৃতিক যোগ্যতা (মউহিবা):** এটি আল্লাহ প্রদত্ত মেধা ও প্রজ্ঞা। ২. **অর্জিত যোগ্যতা (কাসবি):** যা অধ্যবসায় ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.)-এর মতে, কেবল কিতাব পড়লেই ফতোয়ার যোগ্যতা অর্জিত হয় না, বরং দীর্ঘদিনের অনুশীলন বা 'তামরীন' প্রয়োজন।

لَا بُدَّ لِلْمُفْتِي مِنَ الْمَلَكَةِ الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ (অর্থ: মুফতীর জন্য এমন ফিকহী দক্ষতা (মালাকা) থাকা আবশ্যক, যার মাধ্যমে তিনি বিধান বের করতে সক্ষম হন।)

বর্তমান প্রেক্ষাপট: বর্তমান যুগের মুকাল্লিদ মুফতীর জন্য 'আহলিইয়াত' হলো— হানাফি মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে মাসআলা বের করা এবং 'যাহিরুর রিওয়ায়া' ও 'নাওয়াদির'-এর পার্থক্য বোঝার যোগ্যতা থাকা।

প্রশ্ন-১২: মুফতীর দুটি মৌলিক ইলমি গুণ উল্লেখ কর। (اذكر صفتين علميتين أساسيتين للمفتي.)

উত্তর: ফতোয়া প্রদান বা ইফতা একটি গুরুদায়িত্ব। এর জন্য মুফতীর মধ্যে বেশ কিছু ইলমি বা জ্ঞানগত গুণাবলী থাকা আবশ্যক। এর মধ্যে দুটি মৌলিক গুণ হলো:

১. ফিকহ ও উসূলুল ফিকহের গভীর জ্ঞান (العلم بالفقه وأصوله): মুফতীকে অবশ্যই ফিকহ শাস্ত্রে এবং বিধান বের করার মূলনীতিতে (উসূল) পারদর্শী হতে হবে। কেবল মাসআলা মুখস্থ থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং মাসআলার উৎস ও কারণ (ইল্লত) সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَوَاضِعِ الْإِجْمَاعِ وَالْخِلَافِ (অর্থ: তাকে কিতাব, সুন্নাহ এবং ইজমা ও ইখতিলাফের স্থানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে।)

২. আরবী ভাষায় দক্ষতা (التمكن من اللغة العربية): কুরআন, সুন্নাহ এবং ফিকহী কিতাবসমূহের ভাষা আরবী। তাই আরবী ব্যাকরণ, শব্দভাণ্ডার এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের ওপর মুফতীর দখল থাকা অপরিহার্য। যাতে তিনি ইবারতের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে পারেন এবং ভুল ব্যাখ্যা থেকে বেঁচে থাকেন।

উপসংহার: এই দুটি গুণ ছাড়া কেউ ফতোয়ার মসনদে বসার উপযুক্ত হতে পারে না।

প্রশ্ন-১৩: মুফতীর কাজে সৎ নিয়তের গুরুত্ব কী? (ما هي أهمية النية الصالحة في عمل المفتي؟)

উত্তর: ইসলামী শরীয়তে সকল কাজের ফলাফল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। ফতোয়া প্রদান একটি ইবাদত এবং এটি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে দ্বীনের প্রতিনিধিত্ব। তাই এ ক্ষেত্রে 'সৎ নিয়ত' (حسن النية) বা ইখলাস থাকা অত্যন্ত জরুরি।

গুরুত্ব: ১. সওয়াব লাভ: মুফতী যদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে ফতোয়া দেন, তবে তিনি বিশাল সওয়াবের অধিকারী হবেন। হাদীসে এসেছে:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (অর্থ: নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।)

২. আল্লাহর সাহায্য লাভ: সৎ নিয়ত থাকলে ফতোয়া প্রদানে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সাহায্য (তাওফিক) ও নূর লাভ করা যায়। এতে ভুলের সম্ভাবনা কমে যায়।

৩. দুনিয়াবী স্বার্থ ত্যাগ: খ্যাতি, পদমর্যাদা বা অর্থের লোভে ফতোয়া দেওয়া হারাম। এমন নিয়ত ফতোয়ার বরকত নষ্ট করে দেয় এবং তা পরকালে শাস্তির কারণ হয়। মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) বলেন, মুফতীর নিয়ত হতে হবে হক বা সত্য প্রকাশ করা, কাউকে খুশি করা নয়।

প্রশ্ন-১৪: মুফতীর ব্যক্তিগত দুটি আদব উল্লেখ কর। (اذكر اثنين من "آداب المفتي" المتعلقة بشخصه.)

উত্তর: 'আদাবুল মুফতী' বা মুফতীর শিষ্টাচার অধ্যায়ে মুফতীর ব্যক্তিগত চরিত্র ও আচরণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ তার আমলই তার ইলমের সাক্ষ্য দেয়। দুটি প্রধান ব্যক্তিগত আদব হলো:

১. তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি (التقوى والورع): মুফতীর জন্য সবচেয়ে বড় আদব হলো তাকওয়া অবলম্বন করা। তিনি হারাম ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকবেন। যার মধ্যে তাকওয়া নেই, তার ফতোয়ার ওপর মানুষের আস্থা থাকে না। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন:

لَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ عَنْ أَرْبَعَةٍ ... وَرَجُلٍ لَهُ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ لَا يَعْرِفُ مَا يُحَدِّثُ بِهِ

(অর্থ: চার ব্যক্তির ইলম গ্রহণযোগ্য নয়... তার মধ্যে একজন হলো এমন নেককার ব্যক্তি যে জানে না সে কী বলছে।)

২. গাম্ভীর্য ও ধীরস্থিরতা (الوقار والسكينة): মুফতীকে অবশ্যই গাম্ভীর্যপূর্ণ ও ধীরস্থির হতে হবে। চটুলতা, অতিরিক্ত হাসি-তামাশা বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাওয়া-দাওয়া করা মুফতীর শানের খেলাফ। তার চালচলনে এমন ভাবমূর্তি থাকতে হবে যেন মানুষ তাকে দেখে দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।

প্রশ্ন-১৫: ফতোয়ার ক্ষেত্রে অবকাশ অন্বেষণ করা (তাতাব্বু রুখাস)-এর বিধান কী?

(ما حكم تتبع الرخص (التسهيلات) في الفتوى؟)

উত্তর: 'তাতাব্বু রুখাস' (تتبع الرخص) অর্থ হলো বিভিন্ন মাযহাব বা ইমামদের মতামতের মধ্য থেকে নিজের প্রবৃত্তি অনুযায়ী কেবল সহজ বা সুবিধাজনক মতগুলো বেছে নেওয়া, দলিলের তোয়াক্কা না করা। ফতোয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি মারাত্মক ব্যাধি।

শরয়ী বিধান: ফকীহ ও উসূলবিদদের ঐকমত্যে (ইজমা), দ্বীন পালনের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি পূজারি হয়ে অবকাশ অন্বেষণ করা **হারাম এবং ফাসেকী কাজ**। সুলাইমান আত-তাইমী (রহ.) বলেন:

لَوْ أَخَذْتَ بِرُخْصَةِ كُلِّ عَالِمٍ، اجْتَمَعَ فِيكَ الشَّرُّ كُلُّهُ (অর্থ: তুমি যদি প্রতিটি আলেমের সহজ মতগুলো (স্খলনগুলো) গ্রহণ কর, তবে তোমার মধ্যে সমস্ত মন্দ একত্রিত হয়ে যাবে।)

হানাফি মাযহাবের নীতি: মুফতীর জন্য ওয়াজিব হলো মাযহাবের 'রাজিহ' বা প্রবল মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া। একান্ত বাধ্যবাধকতা (জরুরত) ছাড়া কেবল সহজ হওয়ার কারণে দুর্বল মত গ্রহণ করা জায়েজ নেই। এটি দ্বীনকে ছেলেখেলায় পরিণত করে।

প্রশ্ন-১৬: মুফতী ফতোয়াপ্রার্থীর সাথে কেমন আচরণ করবেন?
(كيف يتعامل المفتي مع المستفتي (السائل)؟)

উত্তর: ফতোয়াপ্রার্থী বা 'মুস্তাসফতি' হলেন একজন সাহায্যপ্রার্থী, যিনি দ্বীনী সমাধানের জন্য এসেছেন। তাই তার সাথে উত্তম আচরণ করা মুফতীর আদবের অন্তর্ভুক্ত।

আচরণের ধরণ: ১. সুসম্পর্ক ও নম্রতা (اللين والتواضع): মুফতী প্রশ্নকারীর সাথে বিনয় ও নম্রতার সাথে কথা বলবেন। তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন, যাতে সে নির্ভয়ে তার সমস্যার কথা বলতে পারে। ধমক দেওয়া বা বিরক্তি প্রকাশ করা অনুচিত।

২. মনোযোগ দিয়ে শোনা (حسن الاستماع): প্রশ্নকারী কথা বলার সময় মুফতী পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। মাঝপথে কথা কেড়েই উত্তর দেওয়া শুরু করবেন না। যদি প্রশ্ন অস্পষ্ট হয়, তবে বুঝিয়ে বলতে বলবেন।

৩. বোঝা সহজ করা: মুফতী সাধারণ মানুষের বুদ্ধিমত্তা অনুযায়ী সহজ ভাষায় উত্তর দেবেন। কঠিন পরিভাষা ব্যবহার করবেন না। আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, মুফতী হবেন পরম হিতাকাঙ্ক্ষী পিতার মতো।

প্রশ্ন-১৭: প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত 'শারায়িতুল ফতোয়া' (ফতোয়ার শর্তাবলি)-এর একটি কী?
(ما هي إحدى "شرائط الفتوى" المتعلقة بالسؤال؟)

উত্তর: ফতোয়া সঠিক হওয়ার জন্য কেবল মুফতীর যোগ্যতা থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং প্রশ্ন বা 'ইস্তিফতা'-এর মধ্যেও কিছু শর্ত বা গুণাবলী থাকা আবশ্যক। এর মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো:

শর্ত: প্রশ্নটি বাস্তবসম্মত ও স্পষ্ট হওয়া (أن يكون السؤال واقعيا وواضحا): প্রশ্নটি কাল্পনিক বা অপ্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয় না হয়ে বাস্তব সমস্যার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে। এবং প্রশ্নের ভাষা হতে হবে দ্ব্যর্থহীন।

ব্যাখ্যা:

- যদি প্রশ্ন অস্পষ্ট হয়, তবে মুফতীর পক্ষে সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে মুফতী প্রশ্নকারীকে বিস্তারিত জানাতে বলবেন।
- কাল্পনিক বা 'হাইপোথেটিক্যাল' প্রশ্ন যা বাস্তবে ঘটেনি, সালাফগণ তার উত্তর দেওয়াকে অপছন্দ করতেন।

- হাতের লেখা স্পষ্ট হতে হবে এবং প্রশ্নের মধ্যে আদব বজায় রাখতে হবে। আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, প্রশ্ন পরিষ্কার না হলে উত্তর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যার দায়ভার প্রশ্নকারীর ওপর বর্তায়।

প্রশ্ন-১৮: মুফতীর জন্য হানাফী মাযহাবের হাফেয তথা ব্যাপক জ্ঞান রাখা কি শর্ত?

(هل يشترط في المفتي أن يكون حافظا للمذهب الحنفي؟)

উত্তর: প্রাচীন যুগে মুজতাহিদ ইমামদের জন্য বিধান মুখস্থ থাকা জরুরি ছিল। কিন্তু পরবর্তী যুগের (মুতাআখখিরিন) মুফতীদের জন্য বিধানটি কিছুটা শিথিল এবং বাস্তবসম্মত।

শরয়ী বিধান: বর্তমান যুগের মুকাল্লিদ মুফতীর জন্য হানাফি মাযহাবের সমস্ত মাসআলা কুরআন হাফেজের মতো মুখস্থ থাকা **শর্ত নয়**। বরং শর্ত হলো— مَعْرِفَةُ مَظَانِّ الْمَسَائِلِ فِي الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ(অর্থ: নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোর কোন অধ্যায়ে কোন মাসআলাটি পাওয়া যাবে, তা জানার দক্ষতা থাকা।)

ব্যাখ্যা: মুফতীর এমন যোগ্যতা থাকতে হবে যেন তিনি প্রয়োজনের সময় দ্রুত সঠিক জায়গা থেকে মাসআলা বের করতে পারেন এবং সঠিক ইবারতটি বুঝতে পারেন। তবে মৌলিক ও জরুরি মাসআলাগুলো মুখস্থ থাকা এবং মাযহাবের উসুল বা নীতিগুলো আয়ত্তে থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্ন-১৯: মসজিদে ফতোয়া দেওয়ার সময় যে শিষ্টাচারগুলো মেনে চলতে হয় তা কী কী?

(ما هي الآداب التي يجب الالتزام بها عند الإفتاء في المسجد؟)

উত্তর: মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর এবং ইবাদতের স্থান। প্রাচীনকাল থেকেই মুফতীগণ মসজিদে বসে ফতোয়া দিতেন। তবে এর জন্য বিশেষ কিছু আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলা জরুরি।

মসজিদে ফতোয়ার আদব: ১. পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা: মুফতী এবং প্রশ্নকারী উভয়কেই পাক-পবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। দুনিয়াবী অসার কথাবার্তা বলা যাবে না। ২. **কিবলামুখী হয়ে বসা:** মুফতী কিবলামুখী হয়ে বসবেন, যা ইলমী মজলিসের আদব। ৩. **আওয়াজ নিচু রাখা:** ফতোয়া আদান-প্রদানের সময় আওয়াজ এমন পর্যায়ে রাখতে হবে যেন নামাজি বা তিলাওয়াতকারীদের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। ৪. **দোকানদারি না করা:** ফতোয়া

দেওয়ার বিনিময়ে মসজিদে বসে টাকা-পয়সা লেনদেন করা বা এটাকে ব্যবসার মতো মনে করা মাকরূহ বা নাজায়েজ। এটি দ্বীনের সম্মান ক্ষুণ্ন করে।

প্রশ্ন-২০: "আদাবুল ফতোয়া"-এর অর্থ কী? (ما معنى "آداب الفتوى"؟)

উত্তর: 'আদাবুল ফতোয়া' (آداب الفتوى) উসূলুল ইফতা শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। এটি দুটি শব্দের সমষ্টি: 'আদাব' (শিষ্টাচার) এবং 'ফতোয়া' (বিধান প্রদান)।

সংজ্ঞা: পারিভাষিক অর্থে, মুফতী ফতোয়া প্রদানের সময় নিজের চরিত্র, প্রশ্নকারীর সাথে আচরণ, ফতোয়া লিখন পদ্ধতি এবং আল্লাহ ভীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে সকল শরয়ী ও নৈতিক নিয়মকানুন মেনে চলেন, তাকে সমষ্টিগতভাবে 'আদাবুল ফতোয়া' বলে।

বিষয়বস্তু: এর আওতাভুক্ত বিষয়গুলো হলো:

- মুফতীর পোশাক-আশাক ও গাম্ভীর্য।
- ফতোয়া লেখার সময় বিসমিল্লাহ ও দোয়া লেখা।
- অস্পষ্টতা পরিহার করা।
- রাগ বা ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফতোয়া না দেওয়া।

মূলত, ফতোয়াকে নির্ভুল, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য করার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শিষ্টাচারই হলো আদাবুল ফতোয়া।

মুজতাহিদদের স্তর ও হানাফী ফকীহগণ

প্রশ্ন-২১: হানাফীদের নিকট 'মুজতাহিদুল মাযহাব'-এর সংজ্ঞা দাও। (عرف "مجتهد المذهب" عند الحنفية.)

উত্তর: উসুলুল ইফতার পরিভাষায় ফকীহগণের বিভিন্ন স্তর বা 'তাবাকাত' রয়েছে। এর মধ্যে দ্বিতীয় স্তর হলো 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' (مجتهد في المذهب)।

১. সংজ্ঞা: আল্লামা ইবনে কামাল পাশা (রহ.)-এর মতে, 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' হলেন তাঁরা, যারা উসূল বা মূলনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের ইমামের (মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা) অনুসরণ করেন, কিন্তু ফুরু বা শাখা মাসআলায় দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে ইজতেহাদ করার যোগ্যতা রাখেন।

هُمُ الْقَادِرُونَ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْأَحْكَامِ مِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ الَّتِي قَرَّرَهَا أُسْتَاذُهُمْ (অর্থ: তাঁরা হলেন এমন ফকীহ, যারা নিজেদের উস্তাদ বা ইমামের নির্ধারিত মূলনীতির আলোকে দলিল থেকে বিধান বের করতে সক্ষম।)

২. বৈশিষ্ট্য:

- তাঁরা উসূলের ক্ষেত্রে ইমামের দ্বিমত করেন না, কিন্তু ফুরু বা শাখা মাসআলায় দ্বিমত করতে পারেন।
- তাঁরা ইমামের অন্ধ অনুসারী নন, বরং দলিলের ভিত্তিতে একমত বা ভিন্নমত পোষণ করেন।

৩. উদাহরণ: হানাফি মাযহাবে **ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)** এবং **ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (রহ.)** হলেন এই স্তরের ফকীহ। অনেক মাসআলায় তাঁরা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, যা মাযহাবের বিশাল সম্পদ।

প্রশ্ন-২২: 'মুজতাহিদে মুতলাক্ব মুনতাসিব'-এর প্রধান উদাহরণ কে? (من هو أبرز مثال لـ"مجتهد مطلق منتسب"؟)

উত্তর: ফকীহগণের স্তবিন্যাসে 'মুজতাহিদে মুতলাক্ব মুনতাসিব' (مجتهد مطلق منتسب) হলো একটি বিশেষ মর্যাদা। এরা জ্ঞানের গভীরতায় স্বাধীন মুজতাহিদের মতো হলেও কোনো এক ইমামের দিকে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন।

১. পরিচয়: 'মুতলাক্ব' মানে স্বাধীন বা পরম, আর 'মুনতাসিব' মানে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ, যাঁদের ইজতেহাদী যোগ্যতা ইমাম আবু হানিফা বা ইমাম শাফেয়ীর (রহ.) মতো পূর্ণাঙ্গ, কিন্তু তাঁরা বিনয়বশত বা বিশেষ কারণে নিজেদের আলাদা মাযহাব তৈরি না করে কোনো প্রধান ইমামের উসূল বা নীতি গ্রহণ করেছেন।

২. প্রধান উদাহরণ: হানাফি মাযহাবের প্রেক্ষাপটে **সাহিবাইন** তথা **ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)** এবং **ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)**-কে অনেক গবেষক এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যদিও ইবনে কামাল পাশা তাঁদের 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' বলেছেন, কিন্তু তাঁদের পাণ্ডিত্য 'মুজতাহিদে মুতলাক্ব'-এর পর্যায়ের। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রহ.)-এর মতে, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ হলেন 'মুজতাহিদে মুনতাসিব'। কারণ তাঁরা ইমাম আবু হানিফার উসূল মানলেও ইজতেহাদে তাঁরা স্বাধীন ছিলেন।

উপসংহার: সুতরাং, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) হলেন 'মুজতাহিদে মুতলাক্ব মুনতাসিব'-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রশ্ন-২৩: 'মুজতাহিদুল মাসায়েল' ও 'মুজতাহিদুল মাযহাব'-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(ما الفرق بين "مجتهد المسائل" و"مجتهد المذهب"؟)

উত্তর: হানাফি ফকীহগণের স্তরবিন্যাসে ২য় স্তর হলো 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' এবং ৩য় স্তর হলো 'মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল'। এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ইজতেহাদের পরিধির ওপর ভিত্তি করে নির্ণীত হয়।

পার্থক্যসমূহ:

পার্থক্যের বিষয়	মুজতাহিদ ফিল মাযহাব (২য় স্তর)	মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল (৩য় স্তর)
১. ইজতেহাদের পরিধি	তাঁরা ইমামের উসূল মেনে চলেন কিন্তু **যেকোনো শাখা মাসআলায়** ইমামের সাথে দ্বিমত করতে পারেন।	তাঁরা ইমামের উসূল ও ফুরু (শাখা) উভয়টি মেনে চলেন। কেবল **যেসব বিষয়ে ইমামের কোনো রিওয়ায়াত নেই**, সেখানে ইজতেহাদ করেন।
২. স্বাধীনতার মাত্রা	এঁদের স্বাধীনতা বা ইখতিয়ার বেশি। তাঁরা দলীলের ভিত্তিতে ইমামের মত পরিবর্তন করতে পারেন।	এঁদের স্বাধীনতা সীমিত। তাঁরা ইমামের মতের বিরোধিতা করেন না, বরং নতুন সমস্যার (নাওয়াজিল) সমাধান বের করেন।

৩. উদাহরণ	ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)।	ইমাম খাসসাফ, ইমাম তাহাবী, ইমাম কারখী (রহ.)।

সারসংক্ষেপ: 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব' ইমামের সমকক্ষ হয়ে বিতর্ক করতে পারেন, কিন্তু 'মুজতাহিদ ফিল মাসায়েল' ইমামের রেখে যাওয়া শূন্যস্থান পূরণ করেন।

প্রশ্ন-২৪: 'মুজতাহিদে তারজীহ' স্তরের দুজন ইমামের নাম উল্লেখ কর। (*اذكر اثنين من الأئمة في طبقة "مجتهدي التخريج".)

(দ্রষ্টব্য: প্রশ্নে বাংলাতে 'তারজীহ' এবং আরবিতে 'তাখরীজ' শব্দ এসেছে। সাধারণত হানাফি স্তরে 'আসহাবুত তারজীহ' ৫ম স্তর এবং 'আসহাবুত তাখরীজ' ৪র্থ স্তর। নিচে বহুল জিজ্ঞাসিত 'আসহাবুত তারজীহ' বা ৫ম স্তরের ইমামদের নাম উল্লেখ করা হলো)

উত্তর: ফকীহগণের স্তরবিন্যাসে ৫ম স্তর হলো 'আসহাবুত তারজীহ' (أصحاب الترجيح)। এদের কাজ হলো মাযহাবের বিভিন্ন বর্ণনার মধ্য থেকে শক্তিশালী মতটিকে প্রাধান্য দেওয়া।

১. কাজ ও দায়িত্ব: এই স্তরের ফকীহগণ নতুন ইজতেহাদ করেন না। বরং ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর ছাত্রদের থেকে বর্ণিত একাধিক মতের মধ্যে কোনটি 'আসহ' (অধিক শুদ্ধ), কোনটি 'আওলা' (উত্তম) বা কোনটি মানুষের জন্য সহজ—তা নির্ধারণ করেন।

২. দুজন প্রসিদ্ধ ইমাম: এই স্তরের প্রধান দুজন ইমাম হলেন:

- **ইমাম আবুল হাসান আল-কুদুরী (রহ.):** প্রসিদ্ধ 'মুখতাসারুল কুদুরী' গ্রন্থের রচয়িতা (মৃত্যু: ৪২৮ হি.)।
- **ইমাম বুরহান উদ্দিন আল-মারগীনানী (রহ.):** বিখ্যাত 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের রচয়িতা (মৃত্যু: ৫৯৩ হি.)।

তাঁরা ফিকহী কিতাবে যখন বলেন "এটিই সহীহ" বা "এটির ওপর ফতোয়া"—তখন তাঁরা তারজীহের দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশ্ন-২৫: হানাফী মাযহাবে 'মুজতাহিদুল ফতোয়া'-এর ভূমিকা কী? (ما هو دور "مجتهد الفتوى" في المذهب الحنفي؟)

উত্তর: সাধারণত ফকীহগণের ৬ষ্ঠ ও ৭ম স্তরকে 'মুকাল্লিদ' বা 'মুজতাহিদুল ফতোয়া' বলা হয়। যদিও তাঁরা পারিভাষিক মুজতাহিদ নন, কিন্তু ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমিকা ও দায়িত্ব: ১. শক্তিশালী ও দুর্বলের পার্থক্য করা (التيميز بين القوي والضعيف): তাঁদের প্রধান কাজ হলো মাযহাবের কিতাবগুলোতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য মতের মধ্য থেকে কোনটি শক্তিশালী (আকওয়া), কোনটি দুর্বল (দয়ীফ), এবং কোনটি পরিত্যক্ত—তা আলাদা করা।

২. ফতোয়াযোগ্য মত নির্ধারণ: তাঁরা নির্ধারণ করেন কোন মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া হবে। যেমন— তাঁরা বলেন, "এই মতটি জাহিরুর রিওয়ায়াহ", "এটি নাওয়াদির", বা "এর ওপরই ফতোয়া (আলাইহিল ফতোয়া)"।

৩. বিভ্রান্তি দূর করা: পরবর্তী যুগের মুফতী যাতে দুর্বল মত গ্রহণ করে বিভ্রান্ত না হন, সে জন্য তাঁরা কিতাবে মতগুলোর মান উল্লেখ করেন। 'কানযুদ দাকায়িক' প্রণেতা ইমাম নাসাফী এবং 'দুররে মুখতার' প্রণেতা আল্লামা হাসকাফী (রহ.) এই দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রশ্ন-২৬: হানাফী মাসয়ালাসমূহের মৌলিক স্তরগুলো কী কী? (ما هي "طبقات مسائل الأحناف" الأساسية؟)

উত্তর: হানাফি মাযহাবের মাসআলাগুলো তাদের উৎস ও বর্ণনার শক্তির ওপর ভিত্তি করে তিনটি মৌলিক স্তরে বিভক্ত। একে 'তাবাকাতুল মাসায়েল' (طبقات المسائل) বলা হয়।

স্তরসমূহ: ১. যাহিরুর রিওয়ায়াহ (ظاهر الرواية) বা উসূলুল মাসায়েল: এটি মাযহাবের প্রথম ও প্রধান স্তর। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে তাঁর প্রধান ছাত্ররা (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ) যে মাসআলাগুলো নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণনা করেছেন এবং যা তাঁদের রচিত মৌলিক কিতাবগুলোতে স্থান পেয়েছে।

২. মাসায়িলুন নাওয়াদির (مسائل النوادر): এটি দ্বিতীয় স্তর। যে মাসআলাগুলো ইমামগণের থেকে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তা 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর কিতাবগুলোতে নেই অথবা সনদের দিক থেকে গায়ের-মুতাওয়াতির (একক বা

বিচ্ছিন্ন) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন— ইমাম মুহাম্মদের 'হারুনিয়্যাহ' কিতাব।

৩. মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত বা ফতোয়া (مسائل الواقعات): এটি তৃতীয় স্তর। ইমামগণের পর পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণ (যেমন— ইমাম তাহাবী, কাজিখান) নতুন উদ্ভূত সমস্যার (নাওয়াজিল) সমাধান হিসেবে যে মাসআলাগুলো ইস্তিম্বাত বা গবেষণা করে বের করেছেন।

উপসংহার: ফতোয়া দেওয়ার সময় এই ক্রমধারা (প্রথমে যাহিরুর রিওয়ায়া, এরপর নাওয়াদির, এরপর ওয়াকিয়াত) অনুসরণ করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন-২৭: 'যাহিরুর রিওয়ায়া'-এর সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা দাও। (عرف "ظاهر الرواية" بإيجاز.)

উত্তর: 'যাহিরুর রিওয়ায়া' (ظاهر الرواية) হানাফি ফিকহের মেরুদণ্ড। শাব্দিক অর্থে এর মানে হলো 'সুস্পষ্ট বর্ণনা'।

সংজ্ঞা: পারিভাষিক অর্থে, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)—এই তিন ইমামের সিদ্ধান্তসমূহ যা ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাঁর **ছয়টি মৌলিক কিতাবে** নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী সনদে (মুতাওয়াতির বা মাশহুর) বর্ণনা করেছেন, তাকে 'যাহিরুর রিওয়ায়া' বা 'উসূলুল মাসায়েল' বলে।

অন্তর্ভুক্ত কিতাবসমূহ (আল-কুতুবুস সিত্তাহ): এই মাসআলাগুলো মূলত ইমাম মুহাম্মদের ৬টি কিতাবে সংরক্ষিত: ১. আল-মাবসুত (আল-আসাল)। ২. আল-জামি'উস সাগীর। ৩. আল-জামি'উল কাবীর। ৪. আস-সিয়ারুস সাগীর। ৫. আস-সিয়ারুল কাবীর। ৬. আয-যিয়াদাত।

গুরুত্ব: ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে অন্য যেকোনো বর্ণনার ওপর 'যাহিরুর রিওয়ায়া' প্রাধান্য পায়। মাযহাবের আমল এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

প্রশ্ন-২৮: 'মাসায়িলুন নাওযাদের' কী? (ما هي "مسائل النوادر"؟)

উত্তর: 'মাসায়িলুন নাওয়াদির' (مسائل النوادر) হলো হানাফি মাসআলার দ্বিতীয় স্তর। 'নাওয়াদির' শব্দটি 'নাদিরা' (বিরল)-এর বহুবচন।

পরিচয়: ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর সাহিবাইন থেকে বর্ণিত এমন সব মাসআলা, যা 'যাহিরুর রিওয়ায়া'-এর কিতাবগুলোতে (যেমন— মাবসুত বা

জামিউস সাগীর) সংকলিত হয়নি, বরং অন্য কিতাবে এসেছে অথবা সনদের দিক থেকে তা মশহুর নয়—সেগুলোকে 'মাসায়িলুন নাওয়াদির' বলে।

উৎস: এগুলো সাধারণত ইমাম মুহাম্মদের গায়ের-যাহিরুর রিওয়ায়া কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। যেমন:

- আল-কাইসানিয়্যাত।
- আল-হারুনিয়্যাত।
- আল-জুরজানিয়্যাত।
- আর-রুকাইয়্যাত। এছাড়া ইমাম আবু ইউসুফের 'কিতাবুল আমালী' এবং ইমাম হাসান ইবনে জিয়াদের বর্ণনাও এর অন্তর্ভুক্ত।

বিধান: সাধারণ অবস্থায় 'যাহিরুর রিওয়ায়া'র বিপরীতে 'নাওয়াদির'-এর ওপর ফতোয়া দেওয়া হয় না। তবে মাশায়েখগণ যদি কোনো কারণে নাওয়াদিরকে প্রাধান্য দেন, কেবল তখনই তা গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন-২৯: 'মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত' কী? (ما هي "مسائل الواقعات"؟)

উত্তর: 'মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত' (مسائل الواقعات) বা 'নাওয়াজিল' হলো হানাফি মাসআলার তৃতীয় স্তর। 'ওয়াকিয়াত' অর্থ হলো 'ঘটনাবলী'।

পরিচয়: ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও তাঁর ছাত্রদের যুগের পরে যেসব নতুন সমস্যা বা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং যার বিধান পূর্ববর্তী ইমামদের (মুতাকেদ্দেমিন) কিতাবে সরাসরি পাওয়া যায়নি, সেসব বিষয়ে পরবর্তী যুগের ফকীহগণ (মুতাআখখিরিন) মাযহাবের উসূল অনুযায়ী ইজতেহাদ করে যে সমাধান দিয়েছেন, তাকে 'মাসায়িলুল ওয়াকিয়াত' বা 'ফতোয়া' বলে।

প্রণেতাগণ: এই স্তরের মাসআলা বের করেছেন এমন ফকীহদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

- ইমাম ইসাম ইবনে ইউসুফ।
- ইমাম ইবনে রুস্তম।
- ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সামাআ।
- ইমাম তাহাবী ও নাতীফী (রহ.)।

এই মাসআলাগুলো সাধারণত 'কিতাবুন নাওয়াজিল' বা 'ফতোয়া' নামক গ্রন্থগুলোতে সংকলিত হয়েছে (যেমন— ফতোয়ায়ে কাজিখান)।

প্রশ্ন-৩০: যে মাসায়েল যাহিরুর রিওয়ায়া-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তা দিয়ে ফতোয়া দেওয়ার বিধান কী?

(ما حكم الإفتاء بالمسائل التي ليست من ظاهر الرواية؟)

উত্তর: হানাফি মাযহাবের মৌলিক নীতি হলো সর্বপ্রথম 'যাহিরুর রিওয়ায়া' অনুসরণ করা। কিন্তু এর বাইরের মাসআলা (যেমন— নাওয়াদির বা ওয়াকিয়াত) দিয়ে ফতোয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে।

বিধান: ১. সাধারণ নিয়ম: যদি কোনো মাসআলায় 'যাহিরুর রিওয়ায়া' موجود (বিদ্যমান) থাকে, তবে তার বিপরীতে 'নাওয়াদির' বা অন্য কোনো মত দিয়ে ফতোয়া দেওয়া জায়েজ নেই। কারণ যাহিরুর রিওয়ায়া হলো মাযহাবের ভিত্তি।
২. **ব্যতিক্রম ও বৈধতা:** নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে যাহিরুর রিওয়ায়া ছাড়াও ফতোয়া দেওয়া যায়:

- **মাশায়েখদের তারজীহ:** যদি পরবর্তী যুগের নির্ভরযোগ্য ফকীহগণ (আসহাবুত তারজীহ) দলিল বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে বলেন যে, "নাওয়াদিরের এই বর্ণনাটিই সঠিক (সহীহ)" অথবা "এর ওপরই ফতোয়া", তবে সেক্ষেত্রে নাওয়াদিরের ওপর ফতোয়া দেওয়া ওয়াজিব হবে।
- **জরুরত ও উরূফ:** যুগের পরিবর্তন বা মানুষের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজেনে (জরুরত) অনেক সময় যাহিরুর রিওয়ায়া ত্যাগ করে নাওয়াদির বা অন্য ইমামের মত গ্রহণ করা হয় (যেমন— ইস্তিসনা বা অর্ডারি পণ্যের বৈধতা)।

উপসংহার: মাশায়েখদের স্পষ্ট সমর্থন (তাসহীহ) ছাড়া মুফতীর জন্য নিজ থেকে যাহিরুর রিওয়ায়া ত্যাগ করা বৈধ নয়।

নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ

প্রশ্ন-৩১: হানাফীদের নিকট 'নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ'-এর দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
(اذكر اثنين من خصائص "الكتب المعتمدة" عند الحنفية.)

উত্তর: হানাফি মাযহাবে হাজারো ফিকহী কিতাব রচিত হয়েছে, কিন্তু সব কিতাব ফতোয়া প্রদানের জন্য সমানভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। একটি কিতাব 'নির্ভরযোগ্য' বা 'মুতামাদ' হওয়ার জন্য ফকিহগণ কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

১. যাহিরুর রিওয়ায়াহ ভুক্ত হওয়া (الاشتمال على ظاهر الرواية): নির্ভরযোগ্য কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তাতে বর্ণিত মাসায়েলগুলো ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর 'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' বা 'উসূল'-এর কিতাব (যেমন— মাবসুত, জামিউস সগীর) থেকে সংগৃহীত হতে হবে। অথবা পরবর্তী যুগের মুজতাহিদগণ (আসহাবুত তারজীহ) সেগুলোকে বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যদি কোনো কিতাবে কেবল বিরল (নাওয়াদির) বা দুর্বল বর্ণনা থাকে, তবে তা ফতোয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য নয়।

২. লেখক নির্ভরযোগ্য ও দক্ষ ফকিহ হওয়া (وثاقة المؤلف وفقهه): কিতাবটি নির্ভরযোগ্য হওয়ার জন্য এর লেখককে অবশ্যই প্রসিদ্ধ 'ফকিহ' হতে হবে। কেবল মুহাদ্দিস বা সুফি হলে চলবে না। লেখকের বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা (দিরায়াত) এবং মাযহাবের নকল করার আমানতদারি প্রশ্নাতীত হতে হবে। যেমন— আল্লামা শামী (রহ.) বা আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর কিতাবগুলো তাঁদের পাণ্ডিত্যের কারণে সর্বজনগ্রাহ্য।

প্রশ্ন-৩২: 'যাহিরুর রিওয়ায়া'-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব কোনটি?
(ما هو أهم كتاب في "ظاهر الرواية"؟)

উত্তর: 'যাহিরুর রিওয়ায়া' বা 'মাসাইলুল উসূল' হলো হানাফি মাযহাবের ভিত্তি। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী (রহ.) রচিত ৬টি কিতাবকে এই নামে অভিহিত করা হয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটি হলো **'আল-মাবসুত'** (المبسوط), যা **'আল-আসাল'** (الأصل) বা 'মূল' নামেও পরিচিত।
গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য: ১. মাযহাবের ভিত্তি: এটিকে 'আল-আসাল' বলা হয় কারণ এটিই হানাফি ফিকহের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ সংকলন। পরবর্তী সকল কিতাব

(যেমন— হিদায়া, কুদূরী) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর ওপর নির্ভরশীল। ২. **ইমামের ইজতেহাদ:** এতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ইজতেহাদ এবং সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মতভেদ বিস্তারিতভাবে দলিলসহ আলোচিত হয়েছে। ৩. **ফতোয়ার মানদণ্ড:** ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতিগণ সর্বপ্রথম এই কিতাবের শরণাপন্ন হন। আল্লামা সারাখসী (রহ.) এই কিতাবেরই বিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'আল-মাবসুত লি-সারাখসী' রচনা করেছেন।

প্রশ্ন-৩৩: হানাফীদের নিকট ফতোয়ার জন্য একটি অ-নির্ভরযোগ্য কিতাবের নাম উল্লেখ কর।

(اذكر اسم كتاب واحد غير معتمد عند الحنفية في الإفتاء.)

উত্তর: হানাফি মাযহাবে এমন কিছু কিতাব রয়েছে, যা ফিকহী মাসআলা সংবলিত হওয়া সত্ত্বেও ফতোয়া প্রদানের জন্য এককভাবে নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ এগুলোতে দুর্বল (জয়ীফ) বর্ণনা, বিচ্ছিন্ন মত (শায) বা যাচাই-বাছাই ছাড়া মাসআলা উল্লেখ করা হয়েছে। এর একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ হলো **'আল-কুনিয়াহ'** (القنية)।

কিতাব পরিচিতি:

- **পুরো নাম:** আল-কুনিয়াহ ফিল ফতোয়া (القنية في الفتوى)।
- **লেখক:** ইমাম মুখতার ইবনে মাহমুদ আয-জাহিদী (মৃত্যু: ৬৫৪ হি.)।

অ-নির্ভরযোগ্য হওয়ার কারণ: আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.) তাঁর 'শরহু উকূদি রসমিল মুফতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, 'আল-কুনিয়াহ' কিতাবে এমন অনেক মাসআলা রয়েছে যা হানাফি মাযহাবের মূলনীতি বা 'যাহিরুর রিওয়ায়া'-এর বিরোধী। লেখক অনেক ক্ষেত্রে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতামতের দিকে ঝুঁকেছেন এবং দুর্বল বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তাই অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবের সমর্থন ছাড়া কেবল এই কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে ফতোয়া দেওয়া বৈধ নয়।

প্রশ্ন-৩৪: হানাফী পরিভাষা 'আল-আসাহ'-এর অর্থ কী?

(ما معنى المصطلح الحنفي "الأصح"؟)

উত্তর: ফতোয়া ও ফিকহ শাস্ত্রে মতভেদপূর্ণ বিষয়ে কোনো একটি মতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে **'আল-আসাহ'** (الأصح) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা।

শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ:

- **শাব্দিক অর্থ:** 'আসাহ' শব্দটি 'সহীহ' (শুদ্ধ)-এর ইসমে তাফজিল বা আধিক্যবাচক রূপ। অর্থ— 'অধিকতর শুদ্ধ' বা 'সবচেয়ে নির্ভুল'।
- **পারিভাষিক অর্থ:** যখন কোনো মাসআলায় ইমামগণের বা মাযহাবের একাধিক বর্ণনা থাকে এবং আমরা বলি এই মতটি 'আল-আসাহ', তখন এর দ্বারা বোঝা যায় যে—বিপরীত মতটিও 'সহীহ' (সঠিক), কিন্তু দলিল ও যুক্তির বিচারে আলোচ্য মতটি তার চেয়েও বেশি শক্তিশালী।

তাৎপর্য: 'আল-আসাহ' শব্দটি সাধারণত হানাফি মাযহাবের ভেতরের মতভেদ (যেমন— ইমাম আবু হানিফা ও সাহিবাইনের মধ্যে) নিরসনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেখানে 'আসাহ' এবং 'সহীহ'—উভয় মত পাওয়া যায়, সেখানে মুফতির জন্য 'আসাহ'-এর ওপর ফতোয়া দেওয়া ওয়াজিব। এটি নিশ্চিত করে যে, গৃহীত মতটি মাযহাবের উসূলের সাথে সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন-৩৫: হানাফী ফিকহের কিতাবসমূহে 'আল-মুতামাদ' (নির্ভরযোগ্য)-এর তাৎপর্য কী?

(ما دلالة المصطلح "المعتمد" في كتب الفقه الحنفي؟)

উত্তর: 'আল-মুতামাদ' (المعتمد) পরিভাষাটি ফতোয়া ও আমলের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্দেশ করে। এর অর্থ হলো— 'নির্ভরযোগ্য' বা 'যার ওপর নির্ভর করা হয়েছে'।

তাৎপর্য ও প্রয়োগ: ১. চূড়ান্ত রায়: যখন ফকিহগণ বলেন "হাজা হুওয়াল মুতামাদ" (এটিই নির্ভরযোগ্য মত), তখন এর অর্থ হলো মাযহাবের সকল জল্পনা-কল্পনা ও মতভেদের পর মুফতিগণ এই মতটিকেই ফতোয়ার জন্য চূড়ান্ত করেছেন। ২. **ফতোয়ার ভিত্তি:** মুফতির জন্য আবশ্যক হলো 'আল-মুতামাদ' মতের অনুসন্ধান করা এবং সে অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া। অন্য কোনো দুর্বল বা বিচ্ছিন্ন মতের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা যাবে না। ৩. **মতভেদের অবসান:** অনেক সময় শক্তিশালী দলিলে একটি মত প্রমাণিত হলেও, পরবর্তী যুগের ফকিহগণ উরফ বা জনকল্যাণের কারণে অন্য একটি মতকে 'মুতামাদ' সাব্যস্ত করেন। এমতাবস্থায় কিয়াসের চেয়ে 'মুতামাদ' মতটিই অগ্রাধিকার পায়। এটি 'আলাইহিল ফতোয়া' (এর ওপরই ফতোয়া)-এর সমার্থক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-৩৬: হানাফী ফকীহগণের পরিভাষায় 'আশ-শাইখান' (দুই শায়খ) কারা? (من هم "الشيخان" في اصطلاح فقهاء الأحناف؟)

উত্তর: ইসলামী জ্ঞানকাণ্ডে 'আশ-শাইখান' (الشيخان) বা 'দুই শায়খ' পরিভাষাটি শাস্ত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে বোঝায়। হাদিস শাস্ত্রে এর দ্বারা ইমাম বুখারি ও মুসলিমকে বোঝানো হলেও, **হানাফি ফিকহের পরিভাষায়** এর দ্বারা ভিন্ন দুই ইমামকে বোঝানো হয়।

পরিচয়: হানাফি ফিকহে 'আশ-শাইখান' বলতে বোঝানো হয়: ১. **ইমামে আজম আবু হানিফা (রহ.)** (মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা)। ২. **ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)** (ইমামের প্রধান ছাত্র ও প্রথম প্রধান বিচারপতি)।

গুরুত্ব: ফিকহী কিতাবে যখন বলা হয় "শাইখাইনের মতে এটি জায়েজ", তখন বুঝতে হবে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ উভয়ে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন। সাধারণত ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতটি তখন ভিন্ন হয়ে থাকে (যাকে 'তরফাইন' বা অন্য পরিভাষায় উল্লেখ করা হয়)। ফতোয়ার ক্ষেত্রে শাইখাইনের ঐক্যবদ্ধ মত অত্যন্ত শক্তিশালী দলিল হিসেবে গণ্য হয়।

প্রশ্ন-৩৭: মাযহাবের মধ্যে তাদের উক্তি: 'দাইফুন কওলুন' (দুর্বল উক্তি)-এর অর্থ কী? (ما معنى قولهم: "قول ضعيف" في المذهب؟)

উত্তর: ফিকহী কিতাবসমূহে কোনো মতের শেষে **'কওলুন দয়ীফুন'** (قول ضعيف) বা দুর্বল উক্তি বলা হলে তা মুফতির জন্য একটি সতর্কবার্তা।

অর্থ ও তাৎপর্য: এর অর্থ হলো, আলোচ্য মতটি মাযহাবের মূলনীতি (উসূল), শক্তিশালী দলিল কিংবা 'যাহিরুর রিওয়ায়া'-এর বিপরীত। এই মতটি মাযহাবের ফকিহদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

বিধান: ১. ফতোয়া প্রদানে নিষেধাজ্ঞা: দুর্বল মতের ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেওয়া বা আমল করা জায়েজ নেই। আল্লামা কাসিম ইবনে কুতলুবুগা (রহ.) বলেন, "যে ব্যক্তি দুর্বল মতের ওপর ফতোয়া দেয়, সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করল এবং ইজমা (ঐকমত্য) লঙ্ঘন করল।" ২. **ব্যতিক্রম:** তবে বিশেষ কোনো জটিল পরিস্থিতিতে (জরুরত) দক্ষ মুফতিগণ শর্তসাপেক্ষে দুর্বল মতের ওপর ফতোয়া দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন, সাধারণ অবস্থায় নয়।

প্রশ্ন-৩৮: 'আল-মুখতার লিল-ইফতা' (ফতোয়ার জন্য মনোনীত)-এর তাৎপর্য কী?

(ما هي دلالة مصطلح "المختار للإفتاء"؟)

উত্তর: 'আল-মুখতার' (المختار) অর্থ হলো নির্বাচিত বা মনোনীত। যখন কোনো ফিকহী মাসআলায় বলা হয় "হুওয়াল মুখতার" (এটিই মনোনীত) বা "আল-মুখতার লিল-ইফতা", তখন তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

তাৎপর্য: ১. ইমামদের মতভেদ নিরসন: সাধারণত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মধ্যে মতভেদ হলে, ফকিহগণ যে মতটিকে দলিলের প্রবলতা বা মানুষের সহজতার জন্য গ্রহণ করেন, তাকে 'আল-মুখতার' বলা হয়। ২. **জনকল্যাণ ও সহজীকরণ:** অনেক সময় কিয়াসের দাবি অনুযায়ী একটি হুকুম কঠিন হয়, কিন্তু মানুষের প্রয়োজন (হাজত) ও যুগের চাহিদার কারণে ফকিহগণ সহজ মতটিকে 'মুখতার' বা পছন্দনীয় বলে ঘোষণা করেন। ৩. **নির্ভরতা:** এটি 'আলাইহিল ফতোয়া'-এর মতোই শক্তিশালী। মুফতির জন্য এই মত গ্রহণ করা নিরাপদ। ফতোয়ায়ে শামী ও দুররে মুখতারে এই পরিভাষাটি বহুল ব্যবহৃত।

প্রশ্ন-৩৯: ফিকহী সংকলনে 'মতন' (মূলপাঠ) ও 'শরাহ' (ব্যাখ্যা)-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(ما الفرق بين "المتن" و"الشرح" في التصنيف الفقهي؟)

উত্তর: ইসলামী ফিকহ চর্চা ও গ্রন্থ রচনার ইতিহাসে 'মতন' (المتن) এবং 'শরাহ' (الشرح) দুটি ভিন্ন ধরনের রচনাশৈলী। মুফতির জন্য এই দুটির পার্থক্য ও গুরুত্ব বোঝা জরুরি।

পার্থক্য: ১. মতন (মূলপাঠ):

- **সংজ্ঞা:** এটি হলো সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ এবং অত্যন্ত পরিমার্জিত ভাষায় রচিত মূল কিতাব।
- **বৈশিষ্ট্য:** এতে দলিল-প্রমাণ ও বিস্তারিত আলোচনা থাকে না। উদ্দেশ্য থাকে মাসআলা মুখস্থ করা। মাতনের মাসআলাগুলো সাধারণত মাযহাবের সবচেয়ে শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য (যাহিরুর রিওয়ায়া) হয়ে থাকে।
- **উদাহরণ:** 'আল-উইকায়া', 'কানযুদ দাকায়িক', 'মুখতাসারুল কুদুরী'।

২. শরাহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ):

- **সংজ্ঞা:** মাতনের অস্পষ্টতা দূর করা এবং বিস্তারিত আলোচনার জন্য যে গ্রন্থ রচিত হয়, তাকে শরাহ বলে।
- **বৈশিষ্ট্য:** এতে দলিল, মতভেদ, কারণ (ইল্লত) এবং অন্যান্য মাযহাবের আলোচনা থাকে।
- **উদাহরণ:** কানযুদ দাকায়িকের শরাহ 'তাবয়ীনুল হাকায়েক', হিদায়ার শরাহ 'ফাতহুল কাদির'।

উপসংহার: নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে মাতনের মাসআলাগুলো শরাহ বা ফতোয়ার কিতাবের চেয়ে অগ্রগণ্য, যদি না মাতনে কোনো স্পষ্ট ভুল থাকে।

প্রশ্ন-৪০: মাযহাবের নির্ভরযোগ্য উক্তির বিপরীত ফতোয়া দেওয়ার বিধান কী? (ما حكم الإفتاء بما يخالف القول المعتمد في المذهب؟)

উত্তর: একজন মুকাল্লিদ মুফতির প্রধান দায়িত্ব হলো নিজ মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ও শক্তিশালী (মুতামাদ) মতের অনুসরণ করা। মাযহাবের নির্ভরযোগ্য উক্তির বিরোধিতা করে ফতোয়া দেওয়ার বিধান অত্যন্ত কঠোর।

শরয়ী বিধান: ১. হারাম ও অবৈধ: হানাফি ফকিহদের ঐকমত্য অনুযায়ী, মাযহাবের মুতামাদ বা 'রাজিহ' (প্রবল) মত ছেড়ে দিয়ে 'মারজুহ' (দুর্বল) বা অন্য কোনো মতের ওপর ফতোয়া দেওয়া **হারাম এবং নাজায়েজ**। ২. **জাহালত ও প্রবৃত্তি পূজা:** আল্লামা ইবনে সালাহ ও আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, যে ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য মত ছেড়ে দুর্বল মত অনুযায়ী ফতোয়া দেয়, সে হয় জাহিল (অজ্ঞ), নতুবা সে শরিয়ত নিয়ে খেল-তামাশাকারী ও প্রবৃত্তি পূজারি। ৩. **বিচার কার্যে:** যদি কোনো কাজি (বিচারক) মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মতের বিপরীতে রায় দেন, তবে তার সেই রায় বাতিল (মারদুদ) বলে গণ্য হবে এবং তা কার্যকর হবে না।

ব্যতিক্রম: কেবলমাত্র দক্ষ ও অভিজ্ঞ ফকিহগণ যদি দেখেন যে, যুগের প্রয়োজনে বা ব্যাপক জনস্বার্থে (জরুরত) নির্ভরযোগ্য মতের ওপর আমল করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তবে তাঁরা সম্মিলিতভাবে অন্য কোনো মত গ্রহণ করতে পারেন। এটি সাধারণ মুফতির কাজ নয়।

তারজীহের মূলনীতি

প্রশ্ন-৪১: 'ক্বাওয়ায়েদু আত-তারজীহ' (অগ্রাধিকারের মূলনীতিসমূহ) কী? (ما هي "قاعدة الترجيح"؟)

উত্তর: 'ক্বাওয়ায়েদু আত-তারজীহ' (قواعد الترجيح) হলো উসূলুল ইফতা বা ফতোয়া শাস্ত্রের এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। যখন কোনো মাসআলায় একাধিক দলিল বা ইমামগণের একাধিক উক্তি পরস্পর বিরোধী হয়, তখন একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেওয়ার নিয়মাবলীকে 'তারজীহের মূলনীতি' বলা হয়।

সংজ্ঞা ও স্বরূপ: পারিভাষিক অর্থে, মুজতাহিদ বা মুফতি যে নীতিমালার ভিত্তিতে দুই বা ততোধিক দলিলের মধ্য থেকে শক্তিশালী দলিলটিকে গ্রহণ করেন এবং দুর্বলটিকে বর্জন বা ব্যাখ্যা করেন, তাকে ক্বাওয়ায়েদু আত-তারজীহ বলে। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.)-এর মতে, হানাফি মাযহাবে ফতোয়া প্রদানের জন্য এই নীতিগুলো জানা ওয়াজিব। কারণ, মাযহাবে একই মাসআলায় ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতে পারে।

গুরুত্ব: ১. সঠিক বিধান নির্ণয়: এই নীতিমালার মাধ্যমেই নির্ধারণ করা হয় কোনটি 'যাহিরুর রিওয়ায়া' (শক্তিশালী বর্ণনা) আর কোনটি 'নাওয়াদির' (বিরল বর্ণনা)।
২. **বিভ্রান্তি দূরীকরণ:** মুফতি নিজের খেয়ালখুশি মতো ফতোয়া দিতে পারেন না। তাকে অবশ্যই মাযহাবের নির্ধারিত তারজীহের উসুল (যেমন— ইমামের মতকে সাহিবাইনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া) মানতে হয়।
মূলত, মাযহাবের বিশাল ভাণ্ডার থেকে 'ফতোয়াযোগ্য' মতটি বের করে আনার ছাঁকনি হলো এই মূলনীতিসমূহ।

প্রশ্ন-৪২: বিভিন্ন উক্তিগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার প্রদানের একটি মূলনীতি উল্লেখ কর।

(اذكر قاعدة واحدة للترجيح بين الأقوال المختلفة.)

উত্তর: হানাফি মাযহাবে ইমামগণের মতভেদের ক্ষেত্রে কোন উক্তিটি গ্রহণ করা হবে, তার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু 'তারজীহের মূলনীতি' রয়েছে। এর মধ্যে একটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও বহুল ব্যবহৃত মূলনীতি হলো:

মূলনীতি:

إِذَا اخْتَلَفَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ، فَالْمُفْتِي بِالْخِيَارِ، وَلَكِنَّ الْأَخْذَ بِقَوْلِ الْإِمَامِ أَوْلَى فِي الْعِبَادَاتِ(অর্থ: যখন ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং তাঁর দুই সঙ্গী (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ)-এর মধ্যে মতভেদ হয়, তখন মুফতি ইখতিয়ার রাখেন (দলিলের ভিত্তিতে নির্বাচন করার)। তবে ইবাদতের ক্ষেত্রে ইমামের মত গ্রহণ করা উত্তম।)

ব্যাখ্যা: ১. ইবাদত বনাম মুআমালাত: নামাজ, রোজা বা হজের মতো ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে সাধারণত ইমামে আজমের সতর্কতা ও দলিল বেশি শক্তিশালী হয়। তাই ফকিহগণ এক্ষেত্রে তাঁর মতকেই 'রাজিহ' বা অগ্রাধিকারযোগ্য মনে করেন। 2. **বিচারকার্য:** তবে বিচার বা কাজী সংক্রান্ত মাসআলায় অনেক সময় ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, কারণ তিনি দীর্ঘকাল প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং মানুষের অবস্থা সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন। ৩. **যাহিরুর রিওয়ায়া:** আরেকটি সাধারণ নিয়ম হলো, 'যাহিরুর রিওয়ায়া'-এর বর্ণনা সর্বদা 'নাওয়াদির'-এর ওপর প্রাধান্য পাবে।

সুতরাং, অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে দলিলের শক্তি এবং মাসআলার প্রকৃতির (ইবাদত না কি মুআমালাত) দিকে লক্ষ্য রাখা এই মূলনীতির সারাংশ।

প্রশ্ন-৪৩: 'আলাইহিল ফতোয়া' (এ মতের উপর ফতোয়া)-এর তাৎপর্য কী? (ما هي دلالة مصطلح "عليه الفتوى"؟)

উত্তর: ফতোয়ার কিতাবসমূহে কোনো মাসআলার শেষে **'আলাইহিল ফতোয়া'** (عليه الفتوى) বা **'বিহি ইউফতা'** (به يفتى) লেখা থাকলে তা বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এটি মুফতির জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশিকা।

অর্থ ও তাৎপর্য: ১. চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত: এর অর্থ হলো, এই মাসআলায় মাযহাবের ভেতরে একাধিক মত বা ইখতিলাফ থাকলেও, পরবর্তী যুগের ফকিহগণ (মুতাআখখিরিন) গবেষণা ও প্রয়োজনের আলোকে এই নির্দিষ্ট মতটিকেই ফতোয়া প্রদানের জন্য নির্ধারণ করেছেন। ২. **কিয়াস বনাম ইস্তিহসান:** অনেক সময় শক্তিশালী কিয়াস বা দলিলে একটি মত প্রমাণিত হয়, কিন্তু মানুষের সহজতার জন্য বা যুগের চাহিদার (জরুরত) কারণে অন্য একটি মতকে গ্রহণ করা হয়। তখন সেই গৃহীত মতের শেষে 'আলাইহিল ফতোয়া' লেখা হয়। ৩. **মুফতির করণীয়:** একজন মুকাল্লিদ মুফতির জন্য ওয়াজিব হলো যেই মতের সাথে 'আলাইহিল ফতোয়া' লেখা আছে, সে অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া। নিজের ইজতেহাদ করে অন্য মত গ্রহণ করা তার জন্য জায়েজ নেই।

উদাহরণ: যেমন— আধুনিক যুগে অর্থের বিনিময়ে কুরআন শিক্ষা দেওয়া জায়েজ কি না। ইমামদের মূল মত 'নাজায়েজ' হলেও পরবর্তী ফকিহগণ দ্বীন রক্ষার স্বার্থে 'জায়েজ' বলেছেন এবং এর সাথেই যুক্ত করেছেন— "আলাইহিল ফতোয়া"।

প্রশ্ন-৪৪: ফিকহী মাসায়েলের প্রেক্ষাপটে 'আত-তাসহীহ' (শুদ্ধ প্রমাণ)-এর অর্থ কী?

(ما هو "التصحيح" في سياق المسائل الفقهية؟)

উত্তর: 'আত-তাসহীহ' (التصحيح) শব্দটি 'সহীহ' বা শুদ্ধ করা থেকে এসেছে। ফিকহ ও উসূলুল ইফতা শাস্ত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ।

সংজ্ঞা ও প্রয়োগ: হানাফি মাযহাবে 'তাসহীহ' বলতে বোঝায়— ইমামগণের একাধিক মতের মধ্য থেকে দলিল ও যুক্তির আলোকে কোনো একটি মতকে 'সহীহ' (বিশুদ্ধ) বা 'আসাহ' (অধিকতর শুদ্ধ) হিসেবে চিহ্নিত করা।

هُوَ تَمْيِيزُ الْقَوْلِ الصَّحِيحِ مِنَ الضَّعِيفِ وَالرَّاجِحِ مِنَ الْمَرْجُوحِ(অর্থ: দুর্বল মত থেকে সহীহ মত এবং কম শক্তিশালী মত থেকে শক্তিশালী মতকে আলাদা করা।)

তাসহীহের শব্দাবলী: কিতাবগুলোতে তাসহীহ বোঝানোর জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন:

- **হুওয়াস সহীহ:** এটিই সঠিক।
- **হুওয়াল আযহার:** এটিই বেশি স্পষ্ট।
- **হুওয়াল মুখতার:** এটিই নির্বাচিত।

গুরুত্ব: মুফতির জন্য তাসহীহ জানা আবশ্যক। কারণ, যে মতটি মাযহাবের ফকিহগণ 'তাসহীহ' করেননি, তার ওপর ফতোয়া দেওয়া মানে হলো মাযহাবের নির্ভরযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করা। 'হেদায়া' বা 'ফতোয়ায়ে শামী'র মতো কিতাবগুলো মূলত এই তাসহীহের কাজই করেছে।

প্রশ্ন-৪৫: 'মফহুমুল মুখালাফ' (বিপরীত ধারণা) কী?

(ما هو "مفهوم المخالف"؟)

উত্তর: উসূলুল ফিকহের একটি সূক্ষ্ম ও বিতর্কিত বিষয় হলো **'মফহুমুল মুখালাফ'** (مفهوم المخالف) বা বিপরীত অর্থ গ্রহণ।

সংজ্ঞা: কোনো বাক্যে বর্ণিত হুকুমের সাথে নির্দিষ্ট কোনো শর্ত বা গুণ উল্লেখ থাকলে, সেই শর্ত বা গুণ না পাওয়া গেলে হুকুমটি বিপরীত হবে— এই বুঝকে 'মফহুমুল মুখালাফ' বলে।

هُوَ إِثْبَاتُ نَقِيضِ حُكْمِ الْمَنْطُوقِ لِلْمَسْكُوتِ عَنْهُ لِانْتِفَاءِ قَيْدٍ مِنَ الْقُيُودِ (অর্থ: বর্ণিত হুকুমের কোনো শর্ত অনুপস্থিত থাকলে অবর্ণিত অংশের জন্য তার বিপরীত হুকুম সাব্যস্ত করা।)

উদাহরণ: হাদিসে এসেছে: "মাঠে চরে বেড়ানো (সায়িমা) ছাগলের জাকাত দিতে হবে।" এখানে 'মফহুমুল মুখালাফ' হলো— "যে ছাগল মাঠে চরে না (বরং ঘরে খাবার দেওয়া হয়), তার জাকাত নেই।" কারণ এখানে 'মাঠে চরা'-র শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে। শাফেয়ী মাযহাবে এটি দলিল হিসেবে গণ্য, কিন্তু হানাফি মাযহাবে এর প্রয়োগ ভিন্ন।

প্রশ্ন-৪৬: হানাফীগণ কেন শরীয়তের বক্তব্যসমূহে 'মফহুমুল মুখালাফা'-কে দলীল হিসেবে গণ্য করেন না?

(لماذا لا يعتبر الحنفية "مفهوم المخالف" حجة في خطابات الشارع؟)

উত্তর: হানাফি উসূল অনুযায়ী, শরিয়তের নস বা বক্তব্যে (কুরআন ও হাদিস) **'মফহুমুল মুখালাফ'** কোনো গ্রহণযোগ্য দলিল নয়। অর্থাৎ, কোনো গুণের উল্লেখ থাকলেই তার বিপরীতটি নিষিদ্ধ বা ভিন্ন হবে—এমনটি জরুরি নয়।

কারণসমূহ: ১. বর্ণনার প্রেক্ষাপট: হানাফিদের মতে, অনেক সময় কোনো গুণ বা শর্ত উল্লেখ করা হয় কেবল ঘটনার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করার জন্য, অথবা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য, অন্যকে বের করে দেওয়ার জন্য নয়। * **উদাহরণ:** আল্লাহ বলেন, "সুদ খাবে না দ্বিগুণ-বহুগুণ।" এখানে 'দ্বিগুণ' শর্তটি অবস্থার ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য। এর মানে এই নয় যে, কম সুদ খাওয়া জায়েজ। ২. **অতিরঞ্জন রোধ:** মফহুমুল মুখালাফ গ্রহণ করলে শরিয়তের অনেক বিধান বাতিল হয়ে যায় বা ভুল অর্থ দাঁড়ায়। ৩. **বিকল্প পদ্ধতি:** হানাফিরা বলেন, যদি বিপরীত হুকুম দিতে হয় তবে তার জন্য আলাদা দলিল বা 'কিয়াস' লাগবে, কেবল শব্দের বিপরীত অর্থ দিয়ে শরিয়ত সাব্যস্ত হয় না।

তবে মানুষের সাধারণ কথাবার্তা বা চুক্তিনামায় হানাফিরাও মফহুমুল মুখালাফকে শর্তসাপেক্ষে স্বীকার করেন।

প্রশ্ন-৪৭: 'ইতিবারুল উরূফ ওয়াল আদা' (প্রথা ও রীতির স্বীকৃতি)-এর মূলনীতিটি কী?
(ما هي "قاعدة اعتبار العرف والعادة"؟)

উত্তর: ইসলামী ফিকহে 'উরফ' (সামাজিক প্রথা) একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। **'ইতিবারুল উরূফ'** বা প্রথার স্বীকৃতি হানাফি মাযহাবের নমনীয়তার পরিচায়ক।

মূলনীতি: ফিকহী কায়দা হলো: **"আল-আদাতু মুহাক্কামাহ"** (العادة محكمة)। অর্থ: "প্রথা বা রীতিনীতি বিচারকের ভূমিকা পালন করে।" অর্থাৎ, মানুষের পারস্পরিক লেনদেন, শব্দচয়ন এবং দৈনন্দিন জীবনের যেসব বিষয়ে শরিয়তের কোনো স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা (Nass) নেই, সেসব বিষয়ে সমাজের প্রচলিত প্রথাই শরয়ী বিধান হিসেবে গণ্য হবে।

প্রয়োগ: ১. শব্দের অর্থ: কেউ বলল "আমি ডিম খাব না"। সমাজের উরফে যদি ডিম বলতে কেবল মুরগির ডিম বোঝায়, তবে মাছের ডিম খেলে শপথ ভঙ্গ হবে না। ২. **লেনদেন:** বিয়ের মোহরানা নগদ না কি বাকি হবে, তা যদি উল্লেখ না থাকে, তবে সমাজের প্রথা অনুযায়ী ফয়সালা হবে।

আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, "উরফ অনুযায়ী সাব্যস্ত বিষয় শরিয়তের দলিল দ্বারা সাব্যস্ত বিষয়ের মতোই।"

প্রশ্ন-৪৮: ফতোয়ার ক্ষেত্রে উরূফ অনুযায়ী আমল করার একটি শর্ত উল্লেখ কর।
(اذكر شرطا واحدا للعمل بالعرف في الفتوى.)

উত্তর: সমাজের যেকোনো প্রথা বা কুসংস্কারকে 'উরফ' হিসেবে মেনে নিয়ে ফতোয়া দেওয়া যায় না। উরফের ওপর ভিত্তি করে ফতোয়া দেওয়ার জন্য ফকিহগণ কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি হলো:

শর্ত: শরিয়তের স্পষ্ট নস-এর বিরোধী না হওয়া (ألا يخالف نصا شرعيا): প্রথাটি অবশ্যই কুরআন ও সুন্নাহর কোনো অকাট্য দলিলের (Nass) বিরোধী হতে পারবে না।

ব্যাখ্যা: যদি কোনো সমাজে সুদের প্রচলন, মদ পানের প্রথা বা পর্দা না করার রীতি থাকে, তবে তা 'ফাসেদ উরফ' (বাতিল প্রথা)। যতই ব্যাপক হোক না কেন, শরিয়তের হারাম বিধানের বিপরীতে এই প্রথা গ্রহণযোগ্য নয়। উরফ কেবল মুবাহ (বৈধ) বা অস্পষ্ট বিষয়ে কার্যকর হয়, হারামের ক্ষেত্রে নয়।

كُلُّ عُرْفٍ وَرَدَ النَّصُّ بِخِلَافِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ(অর্থ: যে প্রথা শরিয়তের নসের বিপরীতে আসে, তা বাতিল।)

প্রশ্ন-৪৯: যে প্রথার ভিত্তিতে বিধান দেওয়া হয়েছিল, যদি তা পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে ফতোয়ার বিধান কী হবে?

(ما حكم الفتوى إذا تغير العرف الذي بني عليه الحكم؟)

উত্তর: হানাফি ফিকহের একটি প্রসিদ্ধ নীতি হলো— **"যুগের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তন।"** এটি মূলত উরফ পরিবর্তনের ফল।

বিধান: যদি পূর্ববর্তী ফকিহগণ কোনো ফতোয়া কেবল তৎকালীন প্রথা বা 'উরফ'-এর ওপর ভিত্তি করে দিয়ে থাকেন (কুরআন-সুন্নাহর সরাসরি নস নয়), এবং পরবর্তীতে সেই প্রথা বদলে যায়, তবে **ফতোয়ার বিধানও পরিবর্তিত হয়ে যাবে**।

উদাহরণ: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর যুগে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার প্রথা ছিল না। তাই তিনি বলেছিলেন, সাক্ষীর গোপন চরিত্র তদন্ত (তাযকিয়া) করার দরকার নেই। কিন্তু পরবর্তী যুগে মানুষের নৈতিক অবক্ষয় দেখে সাহেবাইন (রহ.) ফতোয়া বদলান এবং তদন্ত ওয়াজিব করেন। এটি মাযহাবের পরিবর্তন নয়, বরং উরফ পরিবর্তনের কারণে বিধানের প্রয়োগিক পরিবর্তন। আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, "মুফতিকে অবশ্যই তার যুগের প্রথা সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে, নতুবা সে মানুষের ক্ষতি করবে।"

প্রশ্ন-৫০: তাদের উক্তি: "যুগের পরিবর্তনে বিধানের পরিবর্তনকে অস্বীকার করা যায় না"-এর অর্থ কী?

(ما معنى قولهم: "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة"؟)

উত্তর: এটি 'মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়া' (অটোমান সিভিল কোড)-এর ৩৯ নং ধারা এবং ফিকহী মূলনীতির একটি বিখ্যাত সূত্র।

অর্থ ও তাৎপর্য: ১. প্রথাভিত্তিক বিধান: এই নীতির অর্থ হলো, শরিয়তের যে বিধানগুলো ইবাদত বা আকিদা সংক্রান্ত নয়, বরং মানুষের জাগতিক কল্যাণ (মাসলাহাত) ও প্রথার ওপর নির্ভরশীল, সেগুলো যুগের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। ২. **নমনীয়তা:** ইসলাম কোনো স্থবির ধর্ম নয়। যুগ পাল্টালে মানুষের প্রয়োজন ও সংকট পাল্টায়। ফকিহগণ এই নীতির আলোকে পুরাতন ইজতেহাদ পরিবর্তন করে নতুন সমাধান দেন।

সীমাবদ্ধতা: এই পরিবর্তন কেবল 'ইজতেহাদী' ও 'প্রথাভিত্তিক' বিষয়ে প্রযোজ্য। নামাজ, রোজা, পর্দা বা সুদের মতো কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য (নস) বিধানের ক্ষেত্রে যুগের দোহাই দিয়ে কোনো পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য নয়। হারাম সবসময় হারাম, এবং ফরজ সবসময় ফরজ থাকবে।

মুফতীর আদবসমূহ

প্রশ্ন-৫১: 'আদাবু কিতাবাতিল ফতোয়া' (ফতোয়া লেখার শিষ্টাচার) কী? (ما هو "آداب كتابة الفتوى"؟)

উত্তর: 'আদাবু কিতাবাতিল ফতোয়া' (آداب كتابة الفتوى) হলো ফতোয়া প্রদানের এমন একটি শৈল্পিক ও শরয়ী পদ্ধতি, যার মাধ্যমে মুফতী লিখিত আকারে প্রশ্নকারীর জবাব প্রদান করেন। এটি কেবল উত্তর লেখা নয়, বরং উত্তরটি কীভাবে উপস্থাপন করা হবে তার নীতিমালা।

গুরুত্বপূর্ণ আদবসমূহ: ১. বিসমিল্লাহ ও হামদ: ফতোয়া লেখা শুরু করতে হবে কাগজের ওপরের অংশে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখে। এরপর আল্লাহর প্রশংসা ও দরূদ সংক্ষেপে লেখা মুস্তাহাব। ২. **স্পষ্ট হাতের লেখা:** ফতোয়ার লেখা স্পষ্ট (ওয়াজিহ) ও সুন্দর হতে হবে। কাটাকাটি বা ঘষামাজা করা যাবে না, যাতে প্রশ্নকারী বিভ্রান্ত না হয়। আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, মুফতীর লেখা এমন হতে হবে যা সাধারণ ও বিশেষ সবাই পড়তে পারে। ৩. **দোয়া ও সিলমোহর:** উত্তরের শেষে 'আল্লাহই সর্বজ্ঞ' (ওয়াল্লাহু আলাম) লেখা এবং মুফতীর নাম, স্বাক্ষর ও সিলমোহর ব্যবহার করা জরুরি, যাতে ফতোয়ার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়।

উপসংহার: ফতোয়া লেখার এই শিষ্টাচারগুলো মেনে চলা মুফতীর জন্য জরুরি, যাতে দ্বীনি বিধানের গাম্ভীর্য ও গ্রহণযোগ্যতা বজায় থাকে।

প্রশ্ন-৫২: ফতোয়ার বিন্যাস সাধারণ মানুষের জন্য কীভাবে উপযুক্ত হবে? (كيف تكون صياغة الفتوى مناسبة لعامة الناس؟)

উত্তর: সাধারণ মানুষের (আওয়ামুন্নাস) জন্য ফতোয়া লেখার বিন্যাস বা 'সিয়াগাত' (صياغة) আলেমদের জন্য লেখা ফতোয়া থেকে ভিন্ন হতে হয়। কারণ তাদের ফিকহী পরিভাষা বোঝার ক্ষমতা থাকে না।

উপযুক্ত বিন্যাস পদ্ধতি: ১. সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষা: কঠিন ফিকহী পরিভাষা বর্জন করে মাতৃভাষায় বা প্রচলিত সহজ ভাষায় উত্তর দিতে হবে। ২. **সরাসরি হুকুম বলা:** উত্তরের শুরুতে কোনো ভূমিকা না করে সরাসরি হুকুম (জায়েজ/নাজায়েজ) জানিয়ে দেওয়া উত্তম। যেমন— "হাঁ, এটি বৈধ" বা "না, এটি করা যাবে না"। ৩. **দলিল সংক্ষেপণ:** সাধারণ মানুষের জন্য লম্বা দলিল বা ইমামদের মতভেদ (কিলা ওয়া কলা) উল্লেখ করা অনুচিত। এতে তারা বিভ্রান্ত হতে পারে। কেবল সারসংক্ষেপ বা মূল সিদ্ধান্ত জানানোই যথেষ্ট।

মূলনীতি: হানাফি ফকীহগণ বলেন, "মানুষের বিবেকের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী তাদের সাথে কথা বল।" তাই ফতোয়া হতে হবে সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট এবং আমলযোগ্য।

প্রশ্ন-৫৩: অর্থ ক্ষুণ্ন না করে ফতোয়া সংক্ষিপ্ত করার বিধান কী? (ما حكم اختصار الفتوى دون إخلال بالمعنى؟)

উত্তর: ফতোয়া লেখার ক্ষেত্রে 'ইখতিসার' বা সংক্ষিপ্তকরণ একটি প্রশংসনীয় গুণ, তবে তা অবশ্যই 'গায়ের মুখিল' (যা অর্থ নষ্ট করে না) হতে হবে।

বিধান: ১. বৈধতা ও উত্তম: যদি মুফতী প্রশ্নের উত্তরটি এমনভাবে সংক্ষেপে দেন যে, তাতে মূল হুকুম এবং জরুরি শর্তগুলো চলে আসে, তবে তা জায়েজ এবং উত্তম। একে 'আল-ইজায' (الإيجاز) বলা হয়। দীর্ঘ ফতোয়া অনেক সময় পাঠকের বিরক্তির কারণ হয়। ২. **শর্ত:** সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে যদি জরুরি কোনো কয়েদ (শর্ত) বাদ পড়ে যায়, যার ফলে উত্তরটি ভুল বোঝার অবকাশ থাকে, তবে এমন সংক্ষিপ্তকরণ হারাম। যেমন— 'নামাজ পড়া যাবে না' বলা, কিন্তু 'নিষিদ্ধ সময়ে' কথাটি উল্লেখ না করা।

হানাফি দৃষ্টিভঙ্গি: আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী (রহ.)-এর মতে, ফতোয়ার উত্তর হওয়া উচিত "জামে ও মানে" (সংক্ষিপ্ত শব্দে ব্যাপক অর্থবোধক)। অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা পরিহার করাই মুফতীর দক্ষতা।

প্রশ্ন-৫৪: ফতোয়া লেখার সময় মুফতীর জন্য বর্জনীয় একটি বিষয় উল্লেখ কর। (اذكر أمرا يجب على المفتي تجنبه عند كتابة الفتوى.)

উত্তর: ফতোয়া লেখার সময় মুফতীকে অনেক বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়। এর মধ্যে অন্যতম একটি বর্জনীয় বিষয় হলো **"অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষা ব্যবহার করা"** (الغموض والإبهام)।

ব্যাখ্যা: মুফতী যদি এমন কোনো শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করেন যার একাধিক অর্থ হতে পারে, অথবা উত্তরটি 'হ্যাঁ' না 'না'—তা বোঝা না যায়, তবে তা প্রশ্নকারীর জন্য কোনো উপকারে আসে না। বরং এতে ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন: কেউ জিজ্ঞেস করল "অমুক কাজ কি জায়েজ?" মুফতী উত্তর দিলেন "এতে আলেমদের মতভেদ আছে"। এটি কোনো ফতোয়া হলো না।

করণীয়: মুফতীকে অবশ্যই স্পষ্ট ভাষায় সমাধান দিতে হবে। যদি মতভেদ থাকেও, তবে মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ফতোয়াটি (আল-মুখতার) উল্লেখ করে আমলের পথ বাতলে দিতে হবে।

প্রশ্ন-৫৫: 'নাওয়াবিল' (নতুন সৃষ্ট মাসায়েল)-এ মুফতীর ভূমিকা কী? (ما هو دور المفتي في "النوازل" (القضايا المستجدة)؟)

উত্তর: 'নাওয়াজিল' বা 'নাওয়াবিল' (النوازل) বলতে এমন নতুন সমস্যাগুলোকে বোঝায়, যা পূর্ববর্তী ফকীহগণের কিতাবে সরাসরি উল্লেখ নেই। যেমন— ডিজিটাল কারেন্সি, টেস্ট টিউব বেবি ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে মুফতীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর।

মুফতীর ভূমিকা ও পদ্ধতি: ১. তাখরীজ (التخريج): মুফতীর কাজ হলো নতুন সমস্যাটিকে পূর্ববর্তী ইমামদের বর্ণিত কোনো সদৃশ মাসআলার (নজির) সাথে তুলনা করা। একে 'কিয়াস' বা 'তাখরীজ' বলে। ২. **উসূলের প্রয়োগ:** যদি নজির না পাওয়া যায়, তবে মাযহাবের উসূল বা মূলনীতি প্রয়োগ করে সমাধান বের করা। ৩. **বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ:** আধুনিক জটিল বিষয়ে মুফতী একক সিদ্ধান্ত না দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের (যেমন— ডাক্তার, অর্থনীতিবিদ) মতামত নিয়ে শরয়ী সিদ্ধান্ত দেবেন।

সতর্কতা: নাওয়াজিলের ক্ষেত্রে মুফতীকে অবশ্যই মাযহাবের গণ্ডির ভেতরে থেকে সমাধান দিতে হয়, মনগড়া রায় দেওয়া জায়েজ নেই।

প্রশ্ন-৫৬: 'জরুরত' (অপরিহার্যতা) কীভাবে ফিকহী বিধান পরিবর্তনের উপর প্রভাব ফেলে? (كيف يؤثر "الضرورة" على تغيير الحكم الفقهي؟)

উত্তর: ইসলামী শরীয়তে 'জরুরত' (الضرورة) বা মানবজীবনের অপরিহার্যতা বিধান পরিবর্তনের অন্যতম একটি কারণ। ফিকহী মূলনীতি হলো: **"জরুরত নিষিদ্ধ বস্তুকে বৈধ করে দেয়।"** (الضرورات تبيح المحظورات)।

প্রভাব: ১. হারামকে হালাল করা: জীবন বাঁচানোর তাগিদে বা দ্বীন রক্ষার প্রয়োজনে মুফতী সাময়িকভাবে হারাম কাজকে বৈধ ঘোষণা করতে পারেন। যেমন— অনাহারে মৃত্যুঝুঁকি দেখা দিলে মৃত জন্তুর মাংস খাওয়া জায়েজ। ২. **কঠোরতা শিথিল করা:** সাধারণ অবস্থায় যা মাকরূহ বা নাজায়েজ, জরুরতের

কারণে তা জায়েজ হয়ে যায়। যেমন— চিকিৎসার প্রয়োজনে ডাক্তার কর্তৃক পরনারীর সতর দেখা।

শর্ত: এই পরিবর্তন স্থায়ী নয়। যতক্ষণ জরুরত থাকবে, ততক্ষণই এই শিথিলতা বজায় থাকবে। জরুরত শেষ হলে বিধান আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে। মূলনীতি হলো: "জরুরত তার পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।"

প্রশ্ন-৫৭: মাসায়েলে অগ্রাধিকারের (তারজীহ)-এ 'আল-ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ' (ফিকহী মূলনীতিসমূহ)-এর গুরুত্ব কী?
(ما هي أهمية "القواعد الفقهية" في ترجيح المسائل؟)

উত্তর: 'আল-ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ' (القواعد الفقهية) হলো এমন কিছু সার্বজনীন সূত্র, যা শরীয়তের শত শত মাসআলাকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন— "নিশ্চয়তা সন্দেহ দ্বারা দূর হয় না"।

তারজীহ বা প্রাধান্য প্রদানে গুরুত্ব: ১. দলীলের অনুপস্থিতিতে সমাধান: যখন কোনো মাসআলায় স্পষ্ট নস (কুরআন-সুন্নাহ) বা ইমামদের স্পষ্ট উক্তি পাওয়া যায় না, তখন মুফতী এই ক্বাওয়ায়েদ ব্যবহার করে একাধিক মতের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দেন। ২. **মাযহাবের মেজাজ বোঝা:** কায়দাগুলো মাযহাবের মূল স্পিরিট ধারণ করে। তাই মতভেদের সময় যে মতটি 'ফিকহী কায়দা'র সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ, মুফতী তাকেই 'রাজিহ' বা শক্তিশালী হিসেবে গ্রহণ করেন। ৩. **সামঞ্জস্য বিধান:** পরস্পর বিরোধী দলিলের মধ্যে সমন্বয় সাধনে এই নীতিগুলো বিচারকের ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-৫৮: যে ফতোয়ার ফলে অকল্যাণ (মাফসা দা) দেখা দেয়, তার বিধান কী?
(ما حكم الفتوى المترتب عليها مفسدة؟)

উত্তর: ফতোয়া প্রদানের উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ (মাসলাহাত) নিশ্চিত করা। যদি মুফতী বুঝতে পারেন যে, একটি সঠিক ফতোয়া দিলে বাস্তবে তার চেয়ে বড় কোনো অকল্যাণ বা 'মাফসা দা' (مفسدة) সৃষ্টি হবে, তবে সেই ফতোয়া প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান রয়েছে।

বিধান: শরিয়তের মূলনীতি হলো: **"কল্যাণ অর্জনের চেয়ে অকল্যাণ দূর করা অগ্রগণ্য।"** (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)। তাই ফিতনা, রক্তপাত বা বড় কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকলে মুফতী: ১. সেই ফতোয়া দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন বা চুপ থাকবেন। ২. অথবা হেকমতের সাথে এমন বিকল্প

সমাধান দেবেন যাতে ফিতনা না হয়। যেমন— কোনো সত্য কথা বললে যদি নিরপরাধ মানুষের জান যায়, তবে সেখানে সত্য বলা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। এটি ফিকহুল ওয়াকি বা বাস্তবতার জ্ঞানের দাবি।

প্রশ্ন-৫৯: মুফতী কীভাবে 'সহজতা' (তাইসীর) এবং 'শরয়ী মূলনীতি মেনে চলা' (আল-ইলতিযাম বিন নাস)-এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করবেন?
(كيف يوازن المفتي بين "التيسير" و"الالتزام بالنص"؟)

উত্তর: মুফতীর জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো মানুষের জন্য দ্বীনকে সহজ করা (তাইসীর) এবং একই সাথে শরীয়তের দলিল (নস) থেকে বিচ্যুত না হওয়া।
ভারসাম্য রক্ষার উপায়: ১. শর্তসাপেক্ষ সহজীকরণ: মুফতী কেবল তখনই সহজ ফতোয়া (রুসখত) দেবেন, যখন শরীয়ত তার অনুমতি দিয়েছে (যেমন— সফরে বা অসুস্থতায়)। মনগড়া বা প্রবৃত্তি অনুসারী হয়ে সহজ করা যাবে না। ২. **মাযহাবের ভেতরে থাকা:** কঠিন পরিস্থিতিতে মুফতী হানাফি মাযহাবের ভেতরে থাকা কোনো সহজ মত গ্রহণ করতে পারেন, অথবা প্রয়োজনে অন্য মাযহাবের মত শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু নস বা অকাট্য দলিলের বিরোধিতা করতে পারেন না। ৩. **মধ্যপন্থা:** মুফতী হবেন মধ্যপন্থী—না অতিরিক্ত কঠোর, না অতিরিক্ত ঢিলেঢালা। তাঁর লক্ষ্য হবে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যে রাখা, পাপের লাইসেন্স দেওয়া নয়।

প্রশ্ন-৬০: মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান-এর ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ (ফিকহী মূলনীতিসমূহ) বিষয়ক কিতাবের নাম কী?
(ما هو اسم كتاب المفتي السيد محمد عميم الإحسان في القواعد الفقهية؟)

উত্তর: উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস মুফতী সাইয়্যিদ মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দেদী (রহ.) ফিকহ ও উসূলুল ইফতা শাস্ত্রে অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। আপনার সিলেবাসে তাঁর নাম ও কিতাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
কিতাবের নাম: ফিকহী মূলনীতি বা 'ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহিয়্যাহ' বিষয়ে তাঁর রচিত বিখ্যাত কিতাবটির নাম হলো: **"ক্বাওয়ায়েদুল ফিকহ" (قواعد الفقه)**।
বৈশিষ্ট্য: এই কিতাবটিতে তিনি হানাফি মাযহাবের শত শত ফিকহী মূলনীতি এবং সেগুলোর অধীনে হাজার হাজার মাসআলা অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়েছেন। মুফতী ও ফিকহ গবেষকদের জন্য এটি একটি অপরিহার্য আকর

গ্রন্থ। এছাড়া 'আদাবুল মুফতী' কিতাবটিও তাঁর রচিত, যা সিলেবাসের পাঠ্যপুস্তক।